প্রকাশক—সুপ্রিয় সরকার
এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৪, কলেজ স্কোয়ার,

মূল্য দেড় টাকা
প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৫৩

মুদ্রাকর—শ্রীরামদেব ঝা
ন্যাশান্যাল লিটারেচার প্রেস,
১০৬, কটন ষ্ট্রীট কলিকাতা

সূচী



তিন অধ্যায়

অহিভূষণ হঠাৎ এসে বললো—'ভাই ভবানী, একটা কন্‌ফিডেন্সিয়াল টক ছিল তোর সঙ্গে।'

আড্ডার মাঝখানে বসেছিলাম। বারীন তখন বলছিল—'কি আশ্চর্য্য, মেয়েটাকে মুহূর্তের জন্যও হাসতে দেখলাম না। লোকের দিকে একটু চোখ তুলে তাকাবার সাহস পর্য্যন্ত নেই। এই ধরণের মেয়েদের মতি-গতি যদি একটু অ্যানালিসিস করে দেখ, তাহ'লে বুঝতে পারবে যে, তারা শুধু চায়......।'

পুলিন বাঁড়ুয্যের মেয়ে বন্দনার কথা বলছিল বারীন। এই রকম একটা সুপ্রাসঙ্গিক অবস্থায় এসে অহিভূষণ বাধা দিল। আরও বেশী অপ্রসন্ন হয়ে উঠলাম, অহিভূষণ যখন বললো—'এখানে বলতে পরবো না ভাই, একটু ডিসট্যান্সে যেতে হবে।'

এই রকম বিশ্রী ভাবেই অযথা ইংরেজী বলে অহিভূষণ। ইদানীং আরও বেশী ক'রে বলে। অবশ্য আমরা জানি, অহিভূষণের লেখাপড়া ফোর্থ ক্লাসের চৌকাঠ পার হয়নি। সেই যে আট বছর আগে আমরা অকৃতী অহিকে একা ফোর্থ ক্লাসে রেখে সদলে থার্ডে চলে গেলাম, তারপর থেকে জীবনে সত্যিই ক্লাস হিসেবে ওর সঙ্গে এক হতে পারলাম না। অহি আজও যে আমাদের ক্লাবে ও আড্ডায় আসে সেটা তার নিজেরই আগ্রহ। আমরা ওকে কখনো চাইনি। চলে যেতেও অবশ্য স্পষ্ট করে কখনো বলি না। কিন্তু আমাদের আচরণে সেটা ওর বোঝা উচিত ছিল। অহি যেন আমাদের তাচ্ছিল্যগুলিকে একেবারেই গায়ে

মাখে না। সব জেনে শুনেই সে আমাদের সঙ্গে মেশে। তার প্রতি আমাদের একটা নির্বিকার ঔদাসীন্য অনাগ্রহ ও করুণাকে সে মাথা পেতে মেনে নিয়েছে। অহি যেন আজও আমাদের ক্লাশটা ছাড়তে চায় না। শেষ বেঞ্চের এক কোণে, একটু পৃথক হয়ে, সবার পেছনে বসে থাকবে, তবু আমাদেরই সঙ্গে।

বলতে ভুলে গেছি, বারীনও সেই ফোর্থ ক্লাসেই ফেল করেছিল। আর পড়া শুনা না করে স্কুল ছেড়ে দিল। কিন্তু আজ আট বছর পরেও বারীন আর আমরা যেন এক ক্লাসেই আছি। বারীন কণ্ট্রাকটারী করে, এরই মধ্যে বেশ কিছু, যাকে বলে, বেশ সম্পন্ন হয়ে উঠেছে বারীন। কিন্তু অহি? অহি ঠিক তার উল্টো। অহির কথা একেবারে স্বতন্ত্র। বড় সাংঘাতিকভাবে ফেল করেছে অহি। বাইশ টাকা মাইনের একটি চাকরী করে। দুঃখটা আসলে ঐ বাইশ টাকায় বাঁধা দীনতার জন্য নয়। আসল কথা হলো চাকরীটাই। বড় নীচ নোংরা নগণ্য চাকরী। কখনো কোন ভদ্রলোকের ছেলেকে এরকম চাকরী করতে আমরা দেখিনি, শুনিনি।

খুব ভোরে ঘুম ছেড়ে বাইরে বেড়ানো যাদের অভ্যাস, তারাই শুধু অহিভূষণের চাকরীর স্বরূপ জানে, কারণ তারাই ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখতে পায়। এক হাতে প্রকাণ্ড একটা খাতা, আর এক হাতে একটা লক্কড় সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে সহরের যত লেন আর বাইলেনের মোড়ে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে অহিভূষণ। ভোরের আবছা অন্ধকারের মধ্যে সরুগলির মুখ থেকে এক এক করে চার পাঁচটা অদ্ভুত ধরণের মূর্তি এসে অহির কাছে দাঁড়ায়। খাতাটা খুলে অহি তাদের হাজিরা লেখে। নীচু স্বরে কয়েকটা কথা বলে অহি, কখনো বা বিরক্ত হয়ে ধমক দেয়। তারপরেই অহিভূষণের লক্কড় সাইকেল আবার আর্ত-

নাদ করে ওঠে। আর একটা গলির মোড়ে গিয়ে দাঁড়ায় অহিভূষণ চাটুয্যে।

আমাদের এই ছোট সহরের ছোট মিউনিসিপ্যালিটির একজন কর্মচারী হলো আমাদের পরিচিত ও প্রাক্তন সহপাঠী অহিভূষণ। রাত্রি ভোর হতে না হতে, পাখির ঘুম ভাঙ্গার আগেই মেথরেরা সহরের ময়লা পরিষ্কার করে। এক একটা দল বের হয় ঝাড়ু হাতে রাস্তা ঝাট দিতে। কয়েকটা দল বের হয় মাথার ওপর পুরীষবাহী বড় বড় টিনের টব নিয়ে। দু'চাকার ওপর পিপে বসানো একটা অদ্ভুত ধরণের গাড়ী আছে মিউনিসিপ্যালিটির। একটা বুড়ো বলদ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গাড়ীটাকে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যায়। পিপের গায়ে দু'সারি ফুটো আছে। খুব ভোরে উঠলেই দেখতে পাওয়া যাবে, পিপে গাড়ীটা ভ্রাম্যমান ধারাযন্ত্রের মত হেলে দুলে কঁকিয়ে কঁকিয়ে চলে যাচ্ছে, রাস্তার ধূলোর দৌরাত্ম্যকে শান্তিজল ছিটিয়ে শান্ত করে দিয়ে। আমাদের অহিভূষণের চাকরীটা হলো এই সব কাজ তদারক করা। তারই জন্য বাইশটি টাকা মাইনে পায় অহি। লেখাপড়া শেখেনি, বাপ বেঁচে নেই, বাপের পয়সাও ছিল না। মা আছে, মায়ের অসুখও আছে। তা ছাড়া নিজের পেটের দায় তো আছেই। সামর্থ্য নেই, যোগ্যতা নেই, তাই বোধ হয় এই সামান্য জীবনের দায়টুকু মেটাতে গিয়ে, উপায় খুঁজতে খুঁজতে একেবারে নরকের কাছাকাছি চলে এসেছে অহি। দুপুর বেলা যখন আদালতে দশটার ঘণ্টা বাজে, অর্থাৎ ঠিক যেসময়ে ভদ্রলোকের কাজের জীবন কলরব করে ওঠে, সেই সময়ে এক ভাঙা ঘরের নিভৃতে অহিভূষণের ক্লান্ত শরীর নিঃশব্দে ঝিমোয়। সূর্য্য উঠলে আমরা ঘরের বার হই। সূর্য্য উঠলে অহি ঘরে ঢোকে। আমরা কাছারী রোড দিয়ে গাড়ী ঘোড়া শব্দ ও জনতা ভেদ করে যাই জীবিকা অর্জন করতে। অহি ঘুরে বেড়ায়

নির্জন নিস্তব্ধ ও অবসন্ন শেষরাত্রের অস্পষ্ট গলিঘুঁজির মোড়ে, ড্রেন পায়খানা ডাষ্টবিনসঙ্কুল একটা ক্লেদাক্ত জগতের চোরাপথে।

বিকেল বেলা অহিকে আরও দুবার কাজের ক্ষেত্রে দেখা যায়। লক্কড় সাইকেলটার পিঠে সওয়ার হয়ে মাইল দেড়েক দূরে সহরের বাইরে গিয়ে শ্মশান ঘাটের সিঁড়িতে একবার দাঁড়ায়। ডোমটার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে, মড়া আর চিতার হিসাব নেয়। তার পরেই গিয়ে দাঁড়ায় খালের ধারে—ময়লা ময়দানের কাছে। দুটো ইনসিনারেটারের চিম্‌নি থেকে দগ্ধ পুরীষের দুর্গন্ধ ধূম বাতাস আচ্ছন্ন করে। অহির সাইকেলের শব্দে একটা অলস গৃধিনীর দল আবর্জনার স্তূপের আড়ালে চম্‌কে ওঠে, বড় বড় পাখা ছড়িয়ে আকাশে উঠে চক্কর দিয়ে উড়তে থাকে। অহি দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। উড়ন্ত গৃধিনীর পাখার চঞ্চল ছায়া আর শব্দের নীচে দাঁড়িয়ে এইখানে সূর্য্যাস্ত দেখে অহিভূষণ।

কথায় কথায় অহি বলে—এমন চাকরী থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি? চাকরীর ব্যাপারে কত ভাবে ফাঁকি দিচ্ছে অহি, সেই সব বিবরণ বেশ ফলাও করে মাঝে মাঝে শোনায়। আমাদের একেবারে নিসংশয় করবার জন্য অহি প্রায়ই বলে—'সত্যি বলছি ভবানী, প্রাণ গেলেও আমি গলি ঘুঁজির ভেতর ঢুকতে পারবো না।'

বারীন প্রশ্ন করে—'ময়লা ময়দানে যেতে হয়না তোকে?'

অহি—'কস্মিন্ কালেও না। আমি দূরে রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়েই কাজ দেখি।'

আমি জিজ্ঞাসা করি—'চিতে গুণতে যাস্ না আজকাল?'

অহি সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেয়—মোটেই না! ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হিসাব নিই, শ্মশানে নামি না।

একটু চুপ করে থেকে অহি আবার নিজে থেকেই একটু অস্বাভাবিক

ভাবে গর্ব করে বলতে থাকে—কী ভেবেছে মিউনিসিপ্যালিটি, বাইশটে টাকা মাইনে দেয় বলেই বামুনের ছেলেকে দিয়ে যাচ্ছেতাই করিয়ে নেবে?

আমরা প্রায় একসঙ্গে সবাই হেসে ফেলতাম। অহি একটু আশ্চর্য্য হয়ে তাকিয়ে থাকতো, আমাদের হাসির অর্থ বুঝবার চেষ্টা করতো।

অহির কথা নিয়ে বেশীক্ষণ মাথা ঘামাবার মত উৎসাহ কারও ছিল না। কথা প্রসঙ্গে এক আধটু যা হলো তাই যথেষ্ট। পর মুহূর্ত্তেই আমরা উৎকর্ণ হয়ে উঠতাম, কারণ বারীন একটী সুস্বাদু কাহিনী পরিবেষন আরম্ভ করে দিয়েছে।—কি বলবো ভাই আজকাল যাসব কাণ্ড আরম্ভ করেছে ললিতা! ফিক্ ফিক্ করে হাসে। ইয়া বড় বড় চোখ করে বেপরোয়া তাকিয়ে থাকে। হাবভাবে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছে যে....কিন্তু আমি ভাই ভিড়তে চাই না।

অহি বেফাঁস রসিকতা করে বসে—'তা হ'লে আমি ভিড়ে যাই, কি বল?'

হঠাৎ প্রসঙ্গ বন্ধ করে দিয়ে, মুখটা কঠোর করে অহির দিকে তাকিয়ে বারীন বলে—'তোমাকে এর মধ্যে ফোড়ণ দিতে বলেছে কে?'

এসব কুৎসার অম্বলে ফোড়ণ সচরাচর আমরাই দিয়ে থাকি। অহি কখনো মন্তব্য করতো না, ভদ্রবাড়ীর তরুণীদের নামে কোন রসাল প্রসঙ্গ উঠলেই অহি বরং নিস্পৃহ ভাবে চুপ করে থাকৃতো। অতি পরিচিত এই সব প্রতিবেশিনীদের কাহিনীগুলিও ওর কাছে আজ যেন রাণী পরী আর দেবীর রূপকথার মত এক অতিদূর অলীক দেশের গল্প হয়ে গেছে। এই সব প্রসঙ্গে তাই অহিকে কখনো উৎসাহ প্রকাশ করতে আমরা দেখিনি। এই প্রথম হঠাৎ ভুল করে ফেল্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে বারীনও তাকে সাবধান করে দিল। চুপ কার রইল অহি। আর কখনো তার এ ভুল হয়নি। অহি এই ভাবেই তার অধিকারের

সীমা আমাদের ধমক খেয়েই বুঝে ফেলে। যেন মাথা পেতে ত্রুটী স্বীকার করে নেয়। মেলা মেশার দিক দিয়ে আমাদেরই আড্ডার ছেলে অহি-ভূষণ, আমাদেরই প্রাক্তন সহপাঠি, এক সহরের ছেলে। কিন্তু মনের রুচির দিক থেকে সে যে ভিন্ পাড়ার লোক, সে তত্ব তাকে আমরা কারণে অকারণে বুঝিয়ে দিই। অহিও বুঝতে পারে।

কিন্তু একটি ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম ছিল। সেদিনের আড্ডায় বারীন সেই মেয়েটির নামেই যা-খুসী-তাই বলছিল। মেয়েটির নাম বন্দনা। এই বন্দনারই মতিগতি একটু অ্যানালিসিস করে বারীন বুঝতে পেরেছে যে....।

বন্দনার নামে যখন কথা উঠতো, তিলমাত্র ভদ্রতার সঙ্কোচ বা শ্রদ্ধার বালাই কেউ অনুভব করতো না। বিশেষ করে বারীন। বন্দনাকে একটু ভাল করেই আমরা চিনে ফেলেছি। তাই অবিশ্বাস করার মত কোন প্রশ্ন থাকতে পারে, কষ্ট করে এতটা ভাব্‌বার কোন দরকার ছিল না আমাদের। অন্য কোন মেয়ের সম্পর্কে বারীনের রসনার অসংযম হয়তো আমরা বাধা দিতাম, প্রশ্ন করতাম, সন্দেহ প্রকাশ করতাম। কিন্তু বন্দনা ঠিক সেই সব মেয়েদের দলে নয়, তাদের বাইরে, অনেক নীচে। যদিও আমাদেরই পরিচিত পুলিন বাঁড়ুজ্যের মেয়ে বন্দনা। বন্দনার চারিত্রিক রহস্য নিয়ে সবাই আপ্‌সোস করতো, কটুক্তি করতো, ঘৃণায় ছটফট করে উঠতো। কখনো বা এক ঝাঁক রসিকতার মাছি ভন্‌ভন্‌ করে উঠতো। অহিও হেসে হেসে মাথা নেড়ে মন্তব্য করতো—ডোবালে ডোবালে, ভদ্র সমাজের নাম ডুবিয়ে ছাড়লে ছুঁড়ি।

শুধু এই একটি ক্ষেত্রে অহির অধিকারের সীমা স্মরণ করিয়ে দেবার কথা আমাদের কারও মনে হতো না। এক্ষেত্রে অহির অধিকার যেন পরোক্ষভাবে আমরা স্বীকার করে নিয়েছিলাম। বন্দনাকে কুৎসা করার

এই সমানাধিকার পেয়ে অহি যেন ধন্য হয়ে যেত। মুখ খুলে রসিকতা করতো অহি। এই একটি সুযোগকে বার বার সদ্ব্যবহার করে অহি উপলব্ধি করতো—সে আমাদেরই মধ্যে একজন!

শুধু সন্ধ্যে হলে অহি আমাদের আড্ডায় একবার আসে। না এসে পারে না। নেশাড়ে মানুষ যেমন সন্ধ্যে হলে একবার শুঁড়ির দোকানে না যেয়ে পারে না, অহির অবস্থাটা বোধ হয় সেই রকম। সেই কবে আট বছর আগে আমাদের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তো অহিভূষণ, একই রিং-এ বক্সিং করতো, একই প্যারালাল বার-এ পীকক হতো—সেই পুরাণো নেশা আজও বোধ হয় ছাড়তে পারেনি অহি। একটু বেশী ধোপ-দুরস্ত কাপড়-চোপড় পরে সন্ধ্যে বেলা আমাদের আসরে দেখা দেয়। আমাদের বিদ্রূপ বিরক্তি অশ্রদ্ধা—সবই অকাতরে সহ্য করে। ছেলেবেলায় অহির এক একটা কঠোর ষ্ট্রেট লেফ্‌ট্‌ ও ডান হাতের পাঞ্চ্‌ কতবার আমাদের ছিট্‌কে বের করে দিয়েছে রিং থেকে বাইরে—তিন হাত দূর। আজ যেন সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছে অহি। আমাদের সব অশ্রদ্ধার আঘাত সহ্য করে, সাধ করেই পরাজিত হয়ে আমাদের রিং-এর মধ্যে থাকতে চায় অহিভূষণ।

—একটু ডিসট্যান্সে যেতে হবে ভাই, প্রাইভেট টক আছে।

অহির অনুরোধ শুনে উঠে গিয়ে একটু আড়ালে দাঁড়ালাম। বল্‌লাম —'কি বলছিলি, বল্‌।'

অহি—'তোর কাকাকে একটু বুঝিয়ে বলতে হবে ভাই, যেন আমার নামটা কেটে না দেন।'

আমার কাকা হলেন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। কাকা একটু বেশী পরোপকারী ও সদয় মানুষ। তাই আশ্চর্য্য হলাম, অহিভূষণের মত এক গরীব কর্মচারীর চাকরীটা খাবার মত উৎসাহ তাঁর কেন হবে?

বললাম—'তোকে বরখাস্ত করার কথা হয়েছে নাকি ?'

—'বরখাস্ত নয় ভাই, আমার নামটা কেটে দিচ্ছেন।'

'—বরখাস্ত নয়, নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে, কথাটার অর্থ বুঝতে পারছি না, অহি। ঠিক করে বল্।'

—'তুই তো জানিস, আমার পোষ্টটার নাম ছিল...'

—'না জানি না।'

—আমি হ'লাম এ সি এস।

—সেটা আবার কি জিনিষ ?

—'আমি হলাম অ্যাসিষ্টেণ্ট কন্জারভেন্সী সুপারভাইসার। পাঁচ বছর ধরে এই নাম চলে আসছে। আজ হঠাৎ তোর কাকা চেয়ারম্যান হয়ে কোথায় একটু উপকার করবেন, না উঠে পড়ে লেগেছেন আমার নামটার পেছনে। নামটা বদ্‌লে দিচ্ছেন।'

—তাতে তোর ক্ষতিটা কি ? মাইনে তো আর কমলো না।

—না মাইরি, সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার নাম সহ্য করতে পারবো না, মাইরি। তুই বল্ ভাই, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে .....।

—তোরই বা এত নাম নিয়ে মাথাব্যাথা কেন ? তোর আগে যে লোকটা সর্দার ছিল, সেই মান্‌কিরাম যে তোর চেয়েও বেশী মাইনে পেত।

অহির মুখটা বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। একটু অভিমান করেই যেন বললো —শেষে তুইও মান্‌কিরামের সঙ্গে আমার তুলনা কর্‌লি, ভবানী ?

একটু রাগ করে বললাম—মান্‌কিরাম তোর চেয়ে ছোট কিসে রে অহি ? মানুষকে যে খুব ছোট করে দেখতে শিখেছিস্, অথচ ..।

অহি শুধু চুপ করে তাকিয়ে রইল, কোনো উত্তর দিল না। এইভাবেই সামান্য একটা ধমকে তার সব বিদ্রোহ শান্ত হয়ে যায়। আজও চুপ করে আমার ধমক আর মন্তব্যটাকেই মেনে নিল অহি।

বাড়ীতে ফিরে এসে অহির কথাটা কেন জানি বারবার মনে পড়ছিল। কাকাকে হেসে হেসে বললাম—অহি নামে আপনাদের মিউনিসিপ্যালিটির একজন প্রকাণ্ড অফিসারের ডেসিগ্‌নেশানটা নাকি আপনি খারিজ করে দিচ্ছেন ?

কাকা উত্তর দিলেন—হুঁ, ঐ নামটা আইনতঃ চলে না। ঐ নাম থাকলে মাইনে ও গ্রেড আইন মাফিক করতে হয়। তা ছাড়া, তাহলে অহির চাকরীও থাকে না। কেননা, অ্যাসিষ্টেণ্ট কন্‌জারভেন্সী সুপার-ভাইসার রাখতে হলে ট্রেনিং-নেওয়া পাশ করা লোক চাই। অহির তো সে সব যোগ্যতা নেই।

—কিন্তু সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার নামটা সত্যিই বড় বিশ্রী। গরিব হলেও ভদ্রলোকের ছেলে তো, অহির মনে বড় লেগেছে।

কাকা দুঃখিত হয়ে বললেন—কি করবো বল্‌ ? কোন উপায় নেই। অহির মাইনে তিন টাকা বাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা আছে আমার এবং বাড়িয়ে দেবো ঠিক, কিন্তু ঐ পোষ্টটা, ও ভাবে ঐ নাম দিয়ে রাখবার উপায় নেই। আইনে বাধে।

পরদিন সকাল বেলা অহির কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু ঘরে বসে অহির গলার স্বর শুনতে পেয়ে আবার ঘটনাটা নতুন করে মনে পড়ে গেল। কাকার সেরেস্তায় এসে অহি কাকাকে সেই অনুরোধ নিয়েই আবার পাকড়াও করেছে।

অহি বলছিল—আমার এই পোষ্টের নামটা বদ্‌লে দেবেন না কাকাবাবু।

কাকা বোধ হয় একটু বিরক্ত হয়েই বললেন—কেন হে কাকাবাবু ?

কাকার উত্তরটার মধ্যে এবং গলার স্বরে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রেপর

আভাসও ছিল যেন। অহির মুখে এই 'কাকাবাবু' ডাক হয়তো তিনি পছন্দ করলেন না।

কাকার সেরেস্তার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটু আড়াল থেকে উঁকি দিলাম। দেখলাম, অহি দাঁড়িয়ে আছে। অহির নেংরা খাকি হাফ প্যাণ্ট আর বগলদাবা হাজিরা খাতাটা ওর সর্দারীর সাজটা নিখুত করে তুলেছে। অহির মুখটা আজও কিন্তু সেই পুরানো ধাঁচেই রয়ে গেছে। নাক আর চিবুকে সেই দক্ষিণী নটরাজের ব্রঞ্জের মত ছাঁদটা আজও মুছে যায়নি। গড়নটা কঠিন, কিন্তু ছাঁদটা কোমল। এই অহি একদিন আমাদের স্কুলে প্রাইজের অনুষ্ঠানে কপালে রক্তচন্দনের তিলক কেটে মেঘনাদ সেজেছে, আবৃত্তি করেছে। কী সুন্দর ওকে মানাতো!

আপাততঃ দেখছিলাম, অহিভূষণ কাকার প্রশ্নে একটু কাঁচু-মাচু হয়ে বল্‌লো—আজ্ঞে আমি বল্‌ছিলাম......।

কাকা—কিছু বল্‌তে হবে না তোমাকে। আমি যা করেছি তোমার ভালর জন্যই করেছি। হয়তো মাইনে কিছু বাড়িয়ে দেব যদি.....।

অহি—মাইনে বাড়াবার জন্য আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না, স্যার। কিন্তু আমার পোষ্টের নামটা যদি আপনি একটু অনুগ্রহ করে...।

কাকা আমার পরম দয়ালু মানুষ, কিন্তু ভিক্ষে করবার এত বস্তু থাকতে কেউ এসে পোষ্টের সম্মান ভিক্ষে করবে, সে-ঔদ্ধত্যকে বোধ হয় পৃথিবীর কোন দয়ালু প্রশ্রয় দিতে পারেন না। কাকা হঠাৎ ভয়ানক ভাবে চটে গিয়ে চোখ পাকিয়ে হিন্দী করে বল্‌তে লাগলেন।—মাইনে বাড়ানোর দরকার নেই, না? তবে চাকরীটারই বা কি দরকার হে সর্দার? খুব বাড় বেড়েছে দেখছি?

—আজ্ঞে না হুজুর! সঙ্গে সঙ্গে এক সর্দার স্ক্যাভেঞ্জারের মুখ দীনতায় সঙ্কুচিত হয়ে আর্তস্বরে যেন ক্ষমা প্রার্থনা করে উঠলো।

কাকা বললেন।—যাও, খাড়া মৎ রহো।

অহি আজকাল আর আমাদের সান্ধ্য আড্ডায় প্রতিদিন আসে না। তবে আসে মাঝে মাঝে, একটু গম্ভীর হয়ে থাকে। অহি বোধ হয় আমাদের অন্তরঙ্গতার সীমা সম্বন্ধে সচেতন হয় উঠেছে।

অহির আচরণের এই পরিবর্তন সকলেই লক্ষ্য করলো। আমিই একদিন সকলকে রহস্যটা ফাঁস করে দিলাম—মিউনিসিপ্যালিটী অহিকে সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার নাম দিয়েছে, অ্যাসিষ্টেণ্ট কন্‌জারভেন্সী সুপারভাইসার নামটা রদ করে দেওয়া হয়েছে, তাই অভিমান হয়েছে অহির। কাকার আছে এই নিয়ে তর্ক করতে গিয়েছিল। কাকা ধমক দিয়ে খেদিয়ে দিয়েছেন।

এর পরের যেদিন অহি আড্ডাতে এল, সকলে মিলে বেশ মিঠেকড়া করে ধম্‌কে দিল—'তোর আবার এই সব ঘোড়ারোগ কেন রে অহি? মাইনের পরোয়া করিস্ না, তাই নিয়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে মুখের ওপর তর্ক করতে যাস্। সর্দার স্ক্যাভেঞ্জারের কাজটা করবি, অথচ বললে তোর একেবারে মাথা কাটা যাচ্ছে। তুই কি ভাবছিস্ নিজেকে, তুই একটা ভয়ানক রকমের অফিসার?

ধমক খেয়ে প্রতিবাদ করে না অহি। অভিযোগ স্বীকার করে নেয়। আজও অহি নিরুত্তর থেকে অভিযোগ স্বীকার করে নিল। কিন্তু বলিহারি ওর ধৈর্য্য আর সহ্যগুণ! শুধু আমাদের আড্ডার স্পর্শ টুকুর লোভে ও সব সহ্য করতে পারে।

পর পর অনেকদিন পার হয়ে গেল, অহি আর আড্ডায় আসে না। হঠাৎ একদিন হাসতে হাসতে ক্লাবের বৈঠকে দেখা দিল অহি।

বীরভূমের এক গাঁয়ের এক গরীব স্কুলমাষ্টারের মেয়ের সঙ্গে আমাদের

অহির বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে। অহি নিজে গিয়ে মেয়েকে দেখে এসেছে। আমাদের কাছে একটা সলজ্জ আনন্দে সব কথা বললো অহি—মেয়েটী দেখতে বেশ, ম্যাট্রিক ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়েছে, গানটানও গাইতে পারে।

অহি যেন তার জীবনের এক নতুন সূর্য্যোদয়ের কথা বলে চলে গেল। কিন্তু সেই মুহূর্তে সে বুঝতে পারেনি যে, কী বিসদৃশ, কী অশোভন, কী অন্যায় কুকাণ্ডের একটি বার্তা সে আমাদের কাণের কাছে ছেড়ে দিয়ে গেলো। আমাদের মনের শান্তি নষ্ট হলো।

আমরা বুঝলাম, কত বড় ভাওঁতা দিয়ে এক ভদ্রলোকের মেয়ের সর্বনাশ করতে চলেছে অহি। বেচারী স্কুলমাষ্টার কখনো কল্পনাও করতে পারেনি যে এক সর্দার স্ক্যাভেঞ্জারের হাতে তাঁর মেয়েকে তিনি সঁপে দিতে চলেছেন। তিনি হয়তো শুধু জানেন, অ্যাসিষ্টেণ্ট কন্‌জারভেন্সী সুপারভাইসার নামে এক কর্‌করে অফিসারের সঙ্গে তাঁর মেয়ের .....।

সমাজের একটা স্বাভাবিক আত্মরক্ষা করার শক্তি আছে। সেদিনই দু'পাতা চিঠি লিখে সব ব্যাপার আমরা জানিয়ে দিলাম স্কুলমাষ্টার ভদ্রলোককে। অহিও তিন দিন পরে বীরভূমের এক গেঁয়ো ডাকঘর থেকে টেলিগ্রাম পেল—বিয়ের প্রস্তাব বাতিল।

আমাদের যা করবার সব গোপনেই করেছিলাম। অহি কি বুঝলো, তাও আমরা জানি না। কিন্তু অহি আর আমাদের আড্ডায় এল না। এক মাসের মধ্যে নয়, এক বছরের মধ্যে একবারও নয়। এতদিনে সত্যি করে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অহি।

মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে বোধ হয় অনেক দিন আগে থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল অহি। শুধু ধোপদুরস্ত কাপড় পরে জোর করে ভদ্রলোক সাজবার চেষ্টা করতো। অল্পদিনের মধ্যে আমরা দেখলাম, হ্যাঁ খাঁটি

সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার বটে অহি। হাজিরা খাতা বগলে নিয়ে গলিতে গলিতে নিঃসঙ্কোচে ঘুরে বেড়ায়, শ্মশানের চড়ায় নেমে চিতা গুণে আসে, ময়লা ময়দানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ট্রেঞ্চ কাটায়। ড্রেনের পাশে বসে মেরামত তদারক করে। নোংরা খাকি হাফ প্যাণ্ট পরে ক্লেদাক্ত পৃথিবীর চিহ্নিত পথে আন্তরিক নিষ্ঠা নিয়ে চরে বেড়ায় অহি—লক্কড় সাইকেল আর্তনাদ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পুলিনবাবু তার বন্দনা ঠিক এই ধরণের সমস্যাকেই একবার জটিল করে তোলবার চেষ্টা করলো।

দেনা দৈন্য আর বেকার অবস্থায় জীবনের বার আনা ভাগ সময় পণ্ড করে দিয়ে পুলিন বাঁড়ুয্যে শেষকালে জুতোর দোকান খুলেছিলেন। আমরা দেখতাম, পুলিনবাবুর দোকানে মেজের ওপর তিন চারজন মুচি সকাল দুপুর সন্ধ্যা জুতো সেলাই করে। একটা কাঁচের আলমারী ছিল দোকানে, তার মধ্যে নতুন চামড়ার বাণ্ডিল সাজানো—ক্রোম, উইলো-কাফ, কিড আর শ্যামোয়া। দোকান ঘরের মধ্যেই কিছুটা স্থান ভিন্ন করে, একটা ভাল মেহগনি টেবিল আর চেয়ার নিয়ে বসে থাকতেন পুলিনবাবু। টেবিলের পাশে আবার একটা সুন্দর রঙীন পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে বসলে মুচিদের আর ঠিক পাশাপাশি বা মুখোমুখি দেখতে পাওয়া যায় না। ঐ রঙীন পর্দাটা যেন পুলিনবাবুর মনের একটা সতর্ক ও জাগ্রত শ্রেণীমর্য্যাদার প্রতীকের মত ঝুলতো। মুচিদের কর্মভূমি থেকে তিনি যেন স্পষ্ট করে তাঁর জীবনের আসরটুকু সযত্নে ভিন্ন করে রাখতেন। শত হোক্, পরলোকগত ত্রৈলোক্য পণ্ডিতের নাতি তো! সাত-পুরুষের কৌলিক চেতনাকে একটা উপার্জনের দায়ের সঙ্গে এককার করে দিতে পারেন না তিনি। তিনজন মুচির মধ্যে এক-

জনকে তিনি মিস্তিরি ব'লে ডাকতেন। আলমারী থেকে চামড়া বের করে মাপ মত কেটে কেটে মুচিদের দেওয়া, খদ্দেরের পায়ের তলায় কাগজ পেতে মাপ এঁকে নেওয়া ইত্যাদি সব কাজ মিস্তিরিই করে। জুতোর দোকানের জুতোত্বর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন না পুলিনবাবু, তাঁর সম্পর্ক শুধু দোকানত্বের সঙ্গে। এর চেয়ে বেশী নীচে নামতে পারেন না পুলিনচন্দ্র বাঁড়ুয্যে।

এই পুলিনবাবুর মেয়ের নাম বন্দনা। এই সহরের স্কুলেই পড়েছে, এপাড়া আর ওপাড়ার মেয়েদের সঙ্গে মিশে কোনকালে মহিলা সমিতির বাৎসরিকীতে অভিনয় করছে। চার বছর আগের কথাই ধরা যাক, আমার ভাগ্নীর বিয়েতে বন্দনা একাই গান গেয়ে বাসর জমিয়েছে। বন্দনার স্কুল-বান্ধবীরা অনেকেই আজ আর বাপের বাড়ীতে নেই; শ্বশুরবাড়ী থেকে তারা মাঝে মাঝে যখন আসে, সবারই সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় তাদের। শুধু দেখা হয়না বন্দনার সঙ্গে। বন্দনা আজ সেই পুরাতন সখীত্বের বৃত্ত থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। বন্দনার খোঁজ বড় কেউ করে না। বন্দনা এখন কি বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে, সবাই জানে সে কথা। সেই সখীত্বের আগ্রহ দূরে থাক্, তাদের মনের দিক দিয়ে অস্পৃশ্যতা গোছের একটা বাধা বন্দনাকে আজ একেবারে অস্পষ্ট করে দিয়েছে।

হাসপাতালে কি একটা কাজ করছে বন্দনা। বন্দনার মা অবশ্য লোকের কাছে বলেন—নার্সের কাজ। কিন্তু তাই বা কি করে হয়? বন্দনা তো নার্সবিদ্যা পাশ করেনি। যাই হোক্, এতটা বাড়াবাড়ি পুলিন বাঁড়ুয্যের উচিত হয়নি। জীবনে টাকার প্রয়োজন কার না আছে? কিন্তু তাই ব'লে সব ভদ্রয়ানার সংস্কার অমান্য করে, সমাজের স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির তোয়াক্কা না করে, রুচি-অরুচির বালাই না রেখে,

শুধু কাজ আর পয়সাকে শ্রেষ্ঠ করে তোলা মানুষের লক্ষণ নয়। এ'কে জীবিকা অর্জন বলে না, এটা হলো জীবনকে বিকিয়ে দেওয়া। পুলিন বাঁড়ুয্যে খুবই গরীব সন্দেহ নেই। তাঁর গরীবত্বের জন্য অবশ্য আমাদের সবারই সমবেদনা আছে। কিন্তু গরীবত্ব ঘোচাবার যে পথ তিনি বেছে নিলেন, সেই পথটাকে কেউ সম্মান করবে না।

পুলিনবাবু বোধ হয় তাঁর ভবিষ্যৎটা বুঝতে পারেননি, নইলে এতটা স্পর্দ্ধা তাঁর হতো না। কিন্তু অতি অল্পদিনেই তিনি বুঝলেন, একেবারে মর্মে মর্মে বুঝলেন।

কাকা একদিন আমাকে ডেকে বললেন—হ্যাঁ রে ভবানী, পুলিন চামারের দোকানে জুতো-টুতো কেমন তৈরী করে? বেশ ভাল?

কাকা অক্লেশে যে কথাটা বললেন, তাতেই হঠাৎ একটা শক্ পেলাম যেন। আজ এক বছরের মধ্যে পুলিন বাঁড়ুয্যে কাকার কাছে কত সহজ ও স্বাভিবিক নিয়মে পুলিন চামার হয়ে গেছে!

বিব্রত ভাবে উত্তর দিলাম—হ্যাঁ, ভালই তৈরী করে।

কাকা—তাহ'লে এবার পূজোর সময় পুলিন চামারকেই অর্ডার দিস্!

কথাটা যেন বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো। ঠাট্টা করে নয়, বেশ সহজ-ভাবেই সকলে পুলিন চামার কথাটা ব্যবহার করে। পুলিনবাবুও নিশ্চয় স্বকর্ণে কথাটা শুনেছেন। এখন বুঝুন তিনি, এই নতুন উপাধির গৌরব প্রতি মুহূর্তে তিলে তিলে উপভোগ করে প্রায়শ্চিত্ত করুন।

জুতোর অর্ডার দিতে গিয়ে দেখলাম, ক'মাসের মধ্যে আশ্চর্য্য রকমের বদ্‌লে গেছেন পুলিনবাবু। এক বছর আগেও আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছেন। আজ আমাকে 'আপনি' করে বললেন। আল-মারী খুলে নানা রকম চাম্‌ড়া বের করে দেখালেন। এক জোড়া অক্স-ফোর্ড হাণ্টিংএর দরকার ছিল আমার। পুলিনবাবু খুসী হয়ে আমার

পায়ের তলায় একটা কাগজ পাতলেন, পেন্সিল দিয়ে মাপ এঁকে নিলেন। ভয়ানক রকম একটা অস্বস্তির মধ্যে আমার পা-টা সিরসির্ করে উঠলো। যেন একটা অপরাধ করছি, মনের কোণে এইরকম একটা দুর্বলতা নিঃশব্দ গঞ্জনার মত পীড়া দিতে লাগলো। এইরকম অপ্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, পুলিনবাবুর আমার পায়ের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে জুতোর মাপ নিচ্ছেন। পুলিনবাবুর হাতের পেন্সিল এক অপার্থিব তুলির মত সুড়সুড়ি দিয়ে আমার পায়ের পাতার চারদিকে ঘুরছে। আমি দেখ-ছিলাম, প্রৌঢ় পুলিনবাবুর কাঁচা-পাকা চুলে ভরা মাথাটা আমার হাঁটুর কাছে হেঁট হয়ে আছে।

এর পরেও দেখেছি, সেই মেহগনি টেবিল চেয়ার আর রঙীন পর্দা নেই। মিস্তিরি নেই। পুলিনবাবু মেজের ওপর জুৎ করে বসে নিজেই কাঁচি দিয়ে হিসেব মত চামড়া কেটে মুচিদের দিচ্ছেন। পুলিন চামারের দোকান সত্যিই সার্থক হয়ে উঠেছে এতদিনে।

বন্দনাকেও আমরা প্রায়ই দেখতে পেতাম, কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো বা রিক্সায় চড়ে হাসপাতালে যায়। বারীন সব চেয়ে বেশী চটে যেত বন্দনার সাজসজ্জার নিষ্ঠা দেখে। নার্সদের অ্যাসিষ্টেন্ট, কুড়ি টাকা মাইনে, তার জুতো সাড়ী আর ব্লাউজের এতটা বাহার একটু বিসদৃশ ঠেকে বৈকি! তার ওপর আবার মাঝে মাঝে রিক্সায় চড়ে! আমরা অবশ্য বন্দনার পক্ষ নিয়ে কখনো-কখনো বারীনকে প্রতিবাদ করতাম—একটু রিক্সাতে চড়লোই বা! এতটা পথ এই দুপুরের রোদে চলাফেরা করা একটা মেয়ের পক্ষে কষ্টকর নয় কি?

বারীন একেবারে ক্ষেপে উঠতো—থাক্ থাক্, আমাকে আর শেখাতে এস না কেউ। জম্‌কালো সাড়ী আর রিক্সার পয়সা যে এমনিতেই হয়, সে তত্ত্ব আমি বুঝি।

পথে বন্দনার সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করেছি, বারীন আমাদের সঙ্গে থাকলে বন্দনা কখন ভুলেও চোখ তুলে তাকাতো না। একটু সঙ্কুচিত হয়ে মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিত। কখনো বা চকিতে মুখটা বিবর্ণ হয়ে উঠতো, যেন হঠাৎ ভয় পেয়েছে। বারীন আবার চটে উঠে বলতো—ঠিক এই, এই ধরণের হাবভাব যেসব মেয়েদের দেখা যায়, যারা ইচ্ছে করেও হাসতে পারে না, চোখ তুলে তাকাতে পারে না, তাদের মতিগতি একটু অ্যানালিসিস করলেই বুঝতে পারবে যে, তারা শুধু চায়...।

পুলিনবাবু তো এরই মধ্যে দমে গিয়ে একেবারে অমানুষ হয়ে গেছেন। কিন্তু পুলিন-গিন্নী দম্‌বার পাত্রী নন। যার স্বামী জুতো বেচে, মেয়ে সদর হাসপাতালে কে-জানে-কি করে, তাকে আজও একটু লজ্জিত হতে দেখিনি। যেকোন পরিচিতা প্রতিবেশিনীর সঙ্গে দেখা হলে আলাপক্রমে একবার নিজের বংশগর্বটাকে বড় করে এবং আলাপিতাকে একটু নীচুঘর প্রমাণ না করে তিনি শান্ত হন না। প্রয়োজন হলে সৌজন্য ভুলে ঝগড়া করতেও কুণ্ঠিত হন না। যে সব বুড়ী নির্জলা একাদশী করতে পারে না, তাদের গায়ে পড়ে দুকথা শুনিয়ে দিয়ে আসেন। তাঁকে কেউ আমল দেয় না, তবু গায়ে পড়ে সবাইকে বিব্রত করেন। পুলিনবাবু আর বন্দনার ঠিক উল্টোটি হলেন পুলিনগিন্নী। কোন বামুনের বাড়ীতে এক ফোঁটা গঙ্গাজল নেই, কারা তিথি নক্ষত্র মানে না, কার মেয়ের অলগ্নে বিয়ে হয়ে গেল—সব খবর রাখেন পুলিন-গিন্নী এবং সবাইকে তার জন্য কটূক্তি করতে ছাড়েন না।

কবে এবং কি করে পুলিন-গিন্নী বন্দনার একটা বিয়ের ব্যবস্থাও প্রায় পাকাপাকি করে ফেলেছেন, তা আমরা আগে জানতে পারিনি। কিন্তু

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। পাত্রের মামা বন্দনাকে আশীর্বাদ করতে এলেন এবং উঠলেন আমাদের বাড়ীতে : পাত্রের মামা আমার কাকার বন্ধু। তাঁর কাছেই সব খবর শুনলাম—তাঁর ভাগ্নে অর্থাৎ পাত্রটী হলো পাটনার একজন প্রফেসর। বেশ ভাল চেহারা, মডার্ণ ও স্মার্ট ছেলে। পুলিন-গিন্নী বন্দনাকে নিয়ে মাত্র দুদিনের জন্য পাটনা গিয়েছিলেন। মেয়ে দেখে পাত্র খুসি হয়েছে, পাত্রপক্ষ রাজী হয়েছে।

আমরা আশ্চর্য হলাম, কাকা আতঙ্কিত হলেন। তারপরে সবাই মিলে হাসতে লাগলাম। কাকার বন্ধুমশায় অপ্রস্তত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি ব্যাপার ?'

কাকা তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন—'যাক্, আপনার ভাগ্য ভাল যে আমার এখানে উঠেছিলেন। আপনার ভাগ্নের জন্য অন্য সম্বন্ধ দেখুন। সব কথা পরে হবে। এখন বিশ্রাম করুন।'

রাত্রি বেলা ক্লাব থেকে ঘরে ফিরেই দেখি পুলিন-গিন্নী খুড়িমার সঙ্গে কথা বলছেন। বারান্দায় চেয়ার টেনে নিয়ে পুলিন-গিন্নীর কথাবার্তা শোনবার জন্য বসলাম।

পুলিন-গিন্নী যেন করুণভাবে আবেদন করছিলেন—'আপনি বিশ্বাস করুন দিদি, বন্দনা কথনো রোগীর বেড প্যান ট্যান ছোঁয় না। চাকরী করে এই মাত্র, তাই বলে ব্রাহ্মণের মেয়ে এতটা নোংরামি করতে পারে দিদি ?

একবার উঁকি দিয়ে পুলিন-গিন্নীর চেহারাটা দেখলাম। সে চেহারাই নয়। একটা প্রচ্ছন্ন আশঙ্কায় পুলিন-গিন্নীর মুখটা নিষ্প্রভ হয়ে আছে। যেন তাঁর সর্বস্ব ডুবতে বসেছে। খুড়িমার কাছে যেন একটা পরিত্রাণের প্রার্থনা বার বার কাতর ভাবে শোনাচ্ছিলেন পুলিন-গিন্নী।

খুড়িমা বললেন—এ সব কথা আমায় বলে লাভ নেই। কর্তারা যা ভাল বুঝবেন, তাই হবে!

পুলিন-গিন্নী যেন ফুঁপিয়ে উঠলেন—আপনি ভবানীর কাকাকে একটু বুঝিয়ে বলুন দিদি। ছেলের মামা ওঁর বন্ধু। আমি জানি, উনি হাঁ বললেই বিয়ে হবে, উনি না বললেই বিয়ে ভেঙে যাবে। উনি তো বন্দনাকে ছেলে বেলা থেকে দেখে আসছেন, উনি জানেন বন্দনা কেমন মেয়ে।

খুড়িমা বললেন—তাই হবে। উনি যদি ভাল বোঝেন তবে…।

পুলিন-গিন্নী ওঠবার আগে খুড়িমার হাত ধরে আর একবার অনুরোধ করলেন—আপনি একটু বুঝিয়ে বলবেন দিদি।

পুলিন-গিন্নী যাবার সময় কাকার বৈঠকখানার দরজার কাছে হঠাৎ কি ভেবে দাঁড়ালেন। কাকা তখন তাঁর বন্ধুকে এই কথা বোঝাচ্ছিলেন—মেয়ে হলো হাসপাতালের জমাদারণী, এই রকম একটি মেয়ের সঙ্গে আপনার ভাগ্নের বিয়ে দিতে চান ?

পাত্রের মামা বাবু কিছুক্ষণ হতভম্ব থেকে বললে—না।

কথাগুলি কানে যাওয়া মাত্র, পুলিন-গিন্নী ছট্‌ফট্‌ করে পালিয়ে গেলেন।

পুলিন-গিন্নীর ষড়যন্ত্র ফেঁসে গেল, এই ব্যাপারে বোধ হয় খুসী হলো সবাই। বারীন খুসী হলো এই কারণে যে, বন্দনার বিয়ে ভেঙে গেল। বন্দনার চেয়েও কত গরীবের মেয়ের বিয়ে হয়েছে বড়লোকের সঙ্গে। তার মধ্যে তো বিসদৃশ কিছু কেউ দেখেনি। গরীব বলে নয়, পুলিন বাঁড়ুয্যে আর বন্দনা, বাপ বেটি মিলে যা বেপরোয়া জুতোটুতো বেচতে আরম্ভ করলো—তারই ফল ফলছে একে একে। সমাজে কুলের প্রশ্ন হয়তো বড় পুরনো হয়ে গেছে, সে-সব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। এটা শীলের প্রশ্ন। এক সমাজে থাকতে হলে একই রকম শীলাচার

মানতে হবেই। তার ব্যতিক্রম হলে সমাজ ক্ষমা করতে পারে না। আমরা কাল্‌চারের দিকটাই দেখছিলাম।

আমরা যে ভুল করিনি, তার প্রমাণ এই যে, বার বার দু'বার আমরা জিতে গেলাম। দু'বারই দুটো অন্যায় হতে চলেছিল, তাই সামান্য আঘাতে ভেঙে গেল। প্রথম অহি, দ্বিতীয় বন্দনা।

ঐ মানুষগুলিও কত সহজে ও সামান্য আঘাতে ভেঙে গেল। সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার বলা মাত্র হুহু করে নেমে গেল অহি। পুলিনবাবুও তাই। চামার নামে শুধু একটা কথার কথায় যেন চামার হয়ে গেলেন। আসলে ওদের মনুষ্যত্বটাই স্ক্যাভেঞ্জার ও চামার হয়ে গিয়েছিল অনেক দিন আগেই। আমরা শুধু মুখোসটা খুলে দিয়েছি। আমাদের দোষ নেই। অপবাদ দিয়ে আমরা ওদের মিথ্যে করে দিয়েছি, একথা সত্য নয়। এবং যেটুকু শিক্ষা আমাদের বাকী ছিল, তাও অল্প দিনের মধ্যে চরম করে শিখিয়ে দিল বন্দনা।

হৃদয়ভেদী এক একটি সংবাদ শুনতে পেলাম। সতু তাদের চাকর-টাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে গিয়েছিল। কম্পাউণ্ডার এসে দুটো টাকা ঘুষ নিয়ে গেল। কোথা থেকে বন্দনাও এসে নির্লজ্জ ও নিষ্কম্প স্বরে চাইলো—আমারও পাওনা আছে। একটা টাকা দিতে হবে। না দিলে...।

শশীদের বাড়ীতে রোগিনী দেখতে লেডী ডাক্তার এসেছিলেন। তার সঙ্গে এসেছিল বন্দনা। লেডী ডাক্তার ফী নিলেন আট টাকা, বন্দনা পেলে এক টাকা। এই ন্যায্য পাওনা ছাড়া অক্লেশে হাত পেতে বক্‌শিস দাবী করে বসলো বন্দনা।—আরও কিছু দিতে হবে। শশীর বাবা কৃপণ মানুষ, বার বার আপত্তি তুললেন। বন্দনা জেদ ছাড়লো না। অপ্রস্তুত হয়ে, অবাক্ হয়ে, শশী তাড়াতাড়ি নিজের পকেট থেকে আট আনা বক্‌শিস দিয়ে উদ্ধার পেল।

সতু আর শশীর কাছে এই কাহিনী আমরা শুনলাম। বুঝলাম সত্যিই মনেপ্রাণে জমাদারণী হয়ে গেছে বন্দনা। একটা চক্ষুলজ্জারও ধার ধারে না।

আমাদের মনেও আর কোন অনুশোচনা নেই। যা করেছি, ভালই করেছি। অহিভূষণকে বন্দনাকে ও পুলিনবাবুকে আমরা ঘৃণা করি না কিন্তু সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার, জমাদারণী ও চামারকে আমরা আমাদের রুচিগত জীবনের আসরে ও বাসরে গ্রাহ্য করতে পারি না। কোন অন্যায় করিনি আমরা, ওদের কোন ক্ষতি করিনি আমরা, ওদের জীবিকাই ওদের কাল্চার নষ্ট করেছে। ওরা যা ওরা তাই। আমরা শুধু নিজেদের বাঁচিয়েছি।

অনেকদিন পরে সমস্যাটা হঠাৎ তৃতীয় অধ্যায়ে পৌঁছে গেল, কিরকম যেন অদ্ভুত হয়ে উঠলো। ক্লাবে গিয়ে দেখলাম, টেবিলে দশ বারোটা রঙীন লেপাফাবদ্ধ চিঠি পড়ে রয়েছে। বিয়ের চিঠি। অহির সঙ্গে বন্দনার বিয়ে। অহি আমাদের নেমন্তন্ন করেছে।

বিশ্রী রকমের একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কি অদ্ভুত কাণ্ড! অহির সঙ্গে বন্দনার বিয়ে! এই কি উচিত হলো! কিন্তু কেন উচিত নয়? এই বিয়ে সমর্থন করতে কোন আনন্দ পাচ্ছি না। কিন্তু অসমর্থন করারও কোন হেতু খুঁজে পাচ্ছি না।

বারীন অযথা রেগে পাগল হয়ে উঠলো। বারীনের মতে এটা হলো অহির সর্বনাশ। বারীন চেঁচাতে লাগলো—'শত বাজে লোক হোক অহি, তবু বন্দনার মত জমাদারণীর সঙ্গে ওর বিয়ে হতে পারে না।'

সতু ও শশী তার চেয়ে জোরে চেঁচিয়ে উত্তর দিল—'বন্দনা যতই যা তা হোক্, কোন সর্দার স্ক্যাভেঞ্জারের সঙ্গে ওর বিয়ে হওয়া উচিত নয়।'

দু'পক্ষেরই আচরণ বড় গর্হিত, হৃদয়হীনতার মত লাগছিল। ওদের নিয়ে আর মাথা ব্যথা কেন? ওরা সরে গেছে, ওরা আমাদের কেউ নয়। ওদের জীবিকা ভিন্ন, তাই ওদের জীবনও ভিন্ন। আজ ওদের কথা নিয়ে এতটা বিতণ্ডা করা আমাদের পক্ষে অনধিকার চর্চা নয় কি?

কিন্তু কার মনে কি আছে কে জানে? পরের মঙ্গলের গরজেই সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সতু ও শশী পুলিন বাবুর কাছে বেনামী চিঠি ছাড়লো—যেন এ বিয়ে না হয়। এত ভাল মেয়ে আপনার, তার জন্য ঐ সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার পাত্র?

বারীন চার পাতা কাগজ ভরে অহিকে চিঠি লিখলো—সাবধান, নিজের সর্বনাশ করো না। বন্দনার মত জমাদারনী মেয়েকে কি তুমি চেন না? যে সব মেয়ে ইচ্ছে করেও হাসতে পারেনা...চোখ তুলে ভদ্রভাবে তাকাতে পারে না, তাদের মতিগতি সম্বন্ধে একটু অ্যানলিসিস করলে দেখতে পাবে যে তারা শুধু চায়...

তাহ'লে কি এ বিয়ে ভেঙে যাবে? এর আগে দু' দু'বার তাদের আমরা ভেঙেছি। আমাদের নাগালের মধ্যে তারা এসেছিল, তাই। আজ কিন্তু ঘটনা সে নিয়মের মধ্যে নেই। তারা নিজের পৃথিবীতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে? তবে কি কোন উপায় নেই।

অহির বিয়ের নিমন্ত্রণ লিপি অর্থাৎ সেই রঙীন খামের চিঠিগুলি ক্লাবের টেবিলের ওপরেই পড়েছিল। কেউ আগ্রহ করে তুলে নেয়নি, সঙ্গেও নিয়ে যায়নি। কোন প্রয়োজন হয়তো ছিল না। প্রতি সন্ধ্যায় তাস খেলার সময় মাত্র দুটি করে সেই রঙীন চিঠির সদ্ব্যবহার করতাম। সিগারেটের ছাই ফেলার জন্য কোন পাত্র তাড়াতাড়িতে পাওয়া যেত না, এহেন সঙ্কটে গোটা দুয়েক রঙীন খামই ভস্মধারের কাজ করতো।

তাস খেলা শেষ হলে ক্লাবের মালী এসে সতরঞ্চি গুটিয়ে রাখতো। ছাই ঠাসা রঙীন খাম দুটো ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিত।

অহি আর বন্দনার বিয়ে নিয়ে তর্জন-গর্জন ধিক্কার ভ্রুকুটি—সবই কেন জানি হঠাৎ চাপা পড়ে গেল। অহির বিয়ের রঙীন আবেদনের চিহ্নগুলি চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও ঘটনাটা যেন কারও মনে পড়লো না। অহির বিয়ের মত একটা ঘটনা, একি নিজের তুচ্ছতায় চাপা পড়ে যাচ্ছে? মাত্র কদিন আগে যারা এই ব্যাপার নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছিল, তারাও যেন আজ ভয় পেয়ে চুপ করে গেছে। বারীন সতু আর শশী এ বিষয়ে কোন কথাই বলে না। শেষ রঙীন খামটা যেদিন আমাদের তাসের আড্ডা থেকে ভস্মাবশেষ নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, সেদিন হঠাৎ আমার একবার কৌতুহল হয়েছিল—অহির বিয়ের দিনটা কবে?

তার পরেই মনে হলো—জেনেই বা কি হবে?

সন্ধ্যের দিকে খুব জোরে বৃষ্টি হয়ে থেমে গেল। ধীরে ধীরে বাড়ী থেকে বের হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। তারপর রওনা হলাম। আজই রাত্রে অহির বিয়ে। কেমন করে তারিখটা সঠিক জানতে পারলাম, জানি না। তবু বুঝলাম পুলিনবাবুর বাড়ীর দিকে চলেছি, একা একা, অন্ধকারে, চুপে চুপে।

বরের আসরে বসেছিল অহি। ছোট একটি সামিয়ানা, ওপরে একটি বেলোয়ারী ঝাড়ের আলো জ্বল্‌ছে। দুটী ছোট ছোট কার্পেট পাতা। তার ওপরে বসে আছে জন কয়েক বরযাত্রী—মিউনিসিপ্যালিটির মুন্সি হীরালাল, রামনাথ, পানওয়ালা, অক্ষয় ময়রার ছেলে গোলক আরও ঐ ধরণের কয়েকজন। সবাই বেশ ভালমত সাজগোজ করে এসেছে, বেশ সজ্জনের মত বসে আছে। বড় কৃতার্থ খুসী ও গর্বিত ভাবে বরযাত্রীরা বসেছিল।

আসরের দিকে আর বেশী দূর এগিয়ে যেতে পারলাম না। আজ আবার অনেক বছর পরে অহির ঘুসি খেয়ে যেন রিং থেকে বাইরে ছিট্‌কে পড়েছি। ঐ রিংএর ভেতর অহি এখন সর্বেশ্বর। সামিয়ানার নীচে যেন এক ভিন্ন পৃথিবীর শান্ত আলো ফুটে রয়েছে। সেখানে সব চেয়ে স্পষ্ট হয়ে আছে অহি। দক্ষিণী ব্রঞ্জের চিবুক আর কপালের ওপরে চন্দনের ছিটে লেগে রয়েছে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে অহিটাকে।

পিঁড়িতে বসিয়ে বন্দনাকে বিয়ের আসরে নিয়ে আসা হলো। বন্দনাও আশ্চর্য করলো। লাল চেলির সাড়ী জড়ানো সলজ্জ ও সন্ত্রস্ত একটা মূর্তি ধনুকের মত বেঁকে রয়েছে। হিন্দুস্থানী পুরুত মন্ত্র পড়লেন। ভীড় নেই, কলরব নেই। আস্তে একবার শাঁখ বাজলো। সকল ভদ্রয়ানার ষড়যন্ত্রের আবর্জনা সরিয়ে পুলিনবাবুর বাড়ীর বাগান আর উঠোনের এক কোণে আজ একটা নতুন সংসারের রূপ স্পষ্ট ও কঠিন হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের দেবতার মিশ্র আড়ালে আড়ালে মেল বেঁধে দিচ্ছেন। কাকা আর ক্লাবের সুগম্ভীর সমাজতত্ত্ব এইখানে এসে চরমভাবে ভুয়ো হয়ে গেছে।

হঠাৎ দেখলাম, আমার পাশে কতকগুলি অপরাধী দাঁড়িয়ে আছে—সতু শশী আর... একে একে সবাই এসেছে। যাক্। কিন্তু বারীন কই?

একটু পরেই দেখলাম, বারীনও আসছে। আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল, তবু আমাদের দেখতে পেল না। বিয়ের আসরটার দিকে এক লক্ষ্য রেখে ধাবে এগিয়ে গেল বারীন। একেবারে আসরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। হিন্দুস্থানী পুরুত তখন জোর চেঁচিয়ে মন্ত্র আবৃত্তি করে হোম করছিলেন। দেখলাম, বারীন হাঁ করে অহির দিকে তাকিয়ে আছে। বারীনকে দেখতে পেয়ে অহির সারামুখে অদ্ভুত একটা হাসি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বন্দনার মাথাটা আরও হেঁট হয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেই বারীন উঠে বারন্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। দেখলাম, পুলিন-গিন্নীর সঙ্গে বারীন একটা বচসা বাধিয়েছে। পুলিন-গিন্নী হাসছেন। তারপর, পুলিনবাবুর কাছে গিয়ে বারীন হাত নেড়ে চেঁচিয়ে যেন একদফা ঝগড়া করলো। পুলিনবাবু হাসতে লাগলেন। পর মুহূর্তে বারীন কোথায় যেন চলে গেল এবং কয়েক মিনিট পরে ফিরে এল। বারীনের সঙ্গে বারীনের জেঠীমা, বারীনের বোন দীপ্তি, বারীনের ভাগ্নী ডলি।

বারীন হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লো। চাকরগুলোকে ধমক দিল। শেষে স্পষ্ট শুনতে পেলাম, পুলিন-গিন্নীর ওপর চটে গিয়ে বারীন গরম গরম কথা বলছে—ছি ছি, কোন একটা ব্যবস্থা নেই আপনাদের। এ কী রকমের কাণ্ড ?

দেখলাম, দীপ্তি আর ডলি একটা ঘর থেকে জিনিষপত্তর টানাটানি করে বের করছে। বাসর ঘর তৈরী করছে। বারীনদের গোমস্তা এক ঝুড়ি ফুল দিয়ে গেল। ঘরের চৌকাঠের কাছে, একটা হ্যাসাক বাতি জ্বাল্‌বার জন্য, খুট্‌খাট্‌ করে কাজ করতে বসলো বারীন।

বারীনের কাণ্ডকারখানা দেখে আমাদের সঙ্কোচ কেটে গিয়েছিল। শেষ কালে একেবারে প্রকাশ্য ভাবেই আসরের কাছে গিয়ে আমরা দেখা দিলাম। বিয়ে তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

বারীন আমাদের দেখেই বলে উঠলো।—এই যে, তোমরা তো শুধু গিলতে এসেছ, গিলেই যাও।

এতক্ষণে সত্যিই একটা বিয়ে বাড়ীর কলরব জেগে উঠেছে। অহি আর বন্দনা আমাদের পাশ দিয়েই বাসর ঘরে চলে গেল। সবাই হাসি মুখে ইসারায় অভিনন্দন জানালাম। লজ্জায় ও আনন্দে অহি আমাদের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

বেশ পেট ভরেই গিলে নিলাম আমরা। বারীন তখনও ব্যবস্থা তদারক করছে। পুলিনবাবু সাম্‌নে এসে একবার বললেন—'লজ্জা করে খেওনা কিন্তু তোমরা। লুচি-মিষ্টি যত খুসী দরকার চেয়ে নেবে।'

আজ তিন বছর পরে পুলিনবাবু হঠাৎ আবার আমাদের 'তুমি' বলে সম্বোধন করলেন।

এইবার আমরা বাড়ী ফিরবো। বারীন তখন বাসর ঘরের কাছে ঘুরঘুর করছিল। ডাকলাম বারীনকে।

বারীন সামনে এসে দাঁড়ালো। বড় বেশী ক্লান্ত দেখাচ্ছিল বারীনকে। কপালটা ঘেমে আছে, আস্তে আস্তে হাঁপাচ্ছে। মাথার উস্কো-খুস্কো চুলের ছায়ায় ওর চোখ দুটো যেন অন্ধকারে লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করছে।

বারীনকে বললাম—'কি হে, আর কতক্ষণ? চল এবার।'

বারীন সেই মুহূর্তে ঘাব্‌ড়ে গিয়ে যেন ব্যস্ত হয়ে পড়লো—'না এখন আমি যাব না। কাজ আছে।'

বারীনের বাড়াবাড়ি দেখে আমরা বিরক্ত বোধ করছিলাম। হয়তো আর একটু পরেই খুব রেগে উঠতাম, কিন্তু আগে বারীন নিজের থেকেই বেফাঁস বলে ফেললে—'খুব কষে চটাচ্ছি, কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে, প্রত্যেক কথায় শুধু হাসছে।'

সকলে এক সঙ্গে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম—'কাকে চটাচ্ছো? কার কথা বলছো? কে হাসছে?'

হঠাৎ সাবধান হয়ে উঠলো বারীন। সাম্‌লে গেল। সেই পুরাতন শ্লথ বিদ্রূপের সুরে, একটু লঘু কুৎসার হাওয়া জাগিয়ে, শুধু কথার চালাকিতে শেষ বারের মত আমাদের ফাঁকি দেবার চেষ্টা করলো—'তোমাদের মিসেস চ্যাটার্জ্জী আবার কে? ফাইন হাসছে কিন্তু, যাই বল।'

আর বলবার কিছু নেই। বারীনকে রেখে আমরা রওনা হলাম। আরও কিছুক্ষণ থাকুক বারীন। আজ যেন ওর অন্তরাত্মা চরম ভাবে হেরে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করছে। আজ বোধ হয় বাবীন সত্যিই অ্যানালিসিস করে বুঝতে পেরেছে যে—এই ধরণের মেয়েরা যারা চোখ তুলে তাকাতে পারতো না, ইচ্ছে করেও হাসতে পারতো না, তারা শুধু চায় যে……।

শিবালয়

সম্মুখে সালের বন, পেছনে তাল আর খেজুরের ছোট ছোট কুঞ্জ, বড় সড়কটা এইখানে এসে ডানদিকে খুব জোরে বেঁকে গেছে। এই বাঁকের ওপর একটা বস্তি। বস্তির মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘরটা হলো অনন্তরামের মুদির দোকান।

এই পথের মোড়, এই নতুন সরাই নামে ছোট বস্তিটার মধ্যেই অনন্তরামের দোকান। পথের উত্তরে ও দক্ষিণে পঁচিশ মাইলের মধ্যে এই একটি পান্থশালার ছায়া ও আলোক।

নামেই মুদির দোকান, কিন্তু শুধু চাল ডাল ছাতু আর কেরোসিন তেল নয়—জঙ্গলের পথে যত যাত্রী যায়, সবারই পক্ষে এই দোকানটি সকল প্রয়োজনের কল্পতরু। এখানে যা আছে, তা তো পাওয়া যাবেই। তা ছাড়া যা আশা করা যায় না, তা'ও পাওয়া যায়, শুধু অনন্তরামের কাছে অনুরোধ করলেই হলো।

যাত্রী বোঝাই বাস থামে চা সরবৎ ছাতু, যা দরকার সবই পাওয়া যাবে। কেউ হয়তো জ্বরের জ্বালায় ধুঁকছেন, শুধু বিশ্বাস করে চাইলে অনন্তরামের কাছে দু'চারটে কব্‌রেজী বড়ি পাওয়া যাবে। কোন কোন সময় মোটর বাস পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যায়। কোনো নিষ্ঠাবান পাঁড়েজীর আহ্নিকের সময় পার হয়ে যেতে বসে। কিন্তু চাইলেই অনন্তরামের কাছে পূজোব উপকরণ সবই পাওয়া যায়—কোশা কুশী ঘট গঙ্গাজল।

হ্যাঁ, পয়সা নেয় অনন্তরাম। কিন্তু শুধু পয়সা রোজগারের জন্যই সে সব সময় তৈরী হয়ে রয়েছে, একথা বিশ্বাস করা উচিত নয় নইলে গ্রীষ্মের সময়, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তৃষ্ণার্ত যাত্রীর জন্য কলসী ভরে এত জল সাজিয়ে রাখতো না অনন্ত। জল দিতে দিতে

অনন্তরাম এত ক্লান্ত হয়ে পড়তো না। এই শ্রান্তির বিনিময়ে কিছুই সে পায় না। বরং, মাঝরাত্রে যখন ছোট প্রদীপের আলোকে সারাদিনের বিক্রীর হিসাব করতে বসে, তখনই শুধু আবিষ্কার করে অনন্ত—সারাদিন শুধু জল বিলোনই সার হয়েছে, বিক্রী ফাঁকিয়ে গেছে, পয়সার বাক্সটা ফাঁকা।

কিন্তু কে বলবে অনন্তরাম সুখী নয়? তার ছোট মুদিখানার দোকানটার মতই তার সুখের রূপ, সবই হাতের কাছে, সবই মুঠোর মধ্যে। তা ছাড়া, প্রমীলার ছুটী কালো চোখের ডুবুডুবু বিস্ময় আর ছুটী অভিমানভরা ঠোঁটের দিকে তাকালেই অনন্তরামের সুখী সংসারের আর একটা রূপ চোখে পড়ে, যেন মহাসাগরেরই একটি টুকরো। সীমা আছে, কিন্তু বৈচিত্র্যের সীমা নেই। কত ঢেউ, কত কলরোল! প্রমীলা যখন অভিমান করে কাঁদে, মনে হয় এ কান্না কখনো শেষ হবে না। যখন খুসী হয়ে হাসে, তখন সে হাসিরও যেন সীমা থাকে না।

আজও এইমাত্র হিসেব শেষ হয়, রাত্রি ঘনায়। প্রদীপের আলো মৃদুতর হয়। কিন্তু অনন্তরাম চুপ করে বসে থাকে। ঘরের ভেতর থেকে কোন সাড়া আসে না। প্রমীলা এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। ইচ্ছে ক'রে, অভিমান ক'রেই ঘুমিয়ে আছে। আজ আর কোনো সাড়া দেবে না প্রমীলা।

ঘরের ভেতর উঠে যেতে চায় না অনন্ত। পিলসুজের কাছেই হয়তো খাবারের থালাটা পড়ে আছে। এক রাশ পুড়ে-মরা পোকা ছড়িয়ে আছে থালার ওপরে, চারিদিকে। এখন মনে হয়, সংসার সাগরের সুখ শুধু লোনা জলের মত। অনন্তের চিন্তায় একটা অকারণ

শাস্তি ও অপমানের জ্বালা যেন ধীরে ধীরে বেদনা ছাড়াতে থাকে। এতদিনেও যেন প্রমীলাকে ঠিক চিনতে পারা গেল না। প্রমীলা জীবনে কি চায়, কি সম্পদ সে খুঁজে খুঁজে হায়রান হচ্ছে, কোথায় তার শুন্যতা, কি তার না-পাওয়া, আজও তার পরিচয় আবিষ্কার করে উঠতে পারেনি অনন্ত। মুখ ফুটে বলুক প্রমীলা—কি পেলে সে সুখী হবে ?

কিন্তু জীবনে কোনোদিনই প্রমীলা বলবে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কত শত অচেনা নরনারী, কত যাত্রী, সাধু ভিখারী অনন্তের কাছে কত জিনিস দাবী করে—কত আবদারের সুরে, কত আশীর্বাদের ভঙ্গীতে কত কৃতজ্ঞতায়! কিন্তু প্রমীলা কিছু দাবী করে না। এক প্রমীলাই শুধু অনন্তের কাছে কিছু চাইতে পারে না।

প্রদীপের সলতে আর একটু উস্কে দেয় অনন্তরাম। গভীর রাত্রির অন্ধকারে শালবনের জংলী হিংসাগুলি যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে এক একটা হালকা ঝড় ছুটছে। এক অখণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে ক্লান্ত পৃথিবীর ফুসফুসটা শুধু হাঁসফাঁস করছে।

তুলসীদাসের রামচরিতখানা সামনে টেনে নেয় অনন্তরাম।

অজহুঁ কছু সংশয় মন মোরে
করহু কৃপা বিনাউঁ কর জোরে

......করজোড়ে মিনতি করি হে কৃপাময়, আজও যে আমার মনে কিছু সংশয় রয়ে গেছে।

বুঝি না, কিসে এই সংশয় ? কেন মন অকারণে উদাস হয়ে যায়। এই তো মাত্র দুটি মাস, প্রমীলা হাসতে হাসতে এই সংসারে দাঁড়ালো।

কিন্তু কিসের এই মেঘ, অভিমানী চাঁদের মত প্রমীলা যার আড়ালে ক্ষণে ক্ষণে লুকিয়ে পড়ে? কিসের দুঃখ!

অনন্তের গলার স্বরের রেশ ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে আসে, দুচোখে ঘুমের আরাম স্বপ্নের মত নেমে আসে। ঘরের ভেতর প্রমীলার হাতের চুড়ির নিক্কন যেন আর একটা স্বপ্নের ভেতর ছট্ ফট্ করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে—তারই শব্দ শুনতে পায় অনন্ত।

আর একবার মনের শেষ উৎসাহ দিয়ে গলার স্বরকে সঞ্জীব করে তুলতে চায় অনন্তরাম—

রাকারজনী ভকতি তব
রামনাম সোই সোম

তোমার ভক্তি পূর্ণিমা রাতের মত; রামনামই তো চন্দ্র। না, মিথ্যা এ সংশয়, অন্ধকার আসবে না, সব স্বচ্ছ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সব দেখতে পাবে তুমি।

এক শূন্যতার রহস্যকে ধরার জন্য, একটা আশ্বাস ও সান্ত্বনাকে অনন্তরামের মিষ্টি গলার সুরে যেন চারদিক অন্বেষণ করে বেড়ায়। শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়ে অনন্ত।

সূর্য উঠবার অনেক আগেই যেন হঠাৎ একটা আলোর ধাঁধায় জেগে ওঠে অনন্ত। রাত্রি শেষে হয়ে এসেছে, ডাকের গাড়ী আসবার সময় হলো। পোড়া প্রদীপটা আবার নতুন শিখার আলোকে জ্বলে উঠেছে, প্রমীলা উঠে এসেছে, অনন্তের হাত ধরে টান্ছে—ছি ছি, আশ্চর্য মানুষ তুমি! এভাবে আমাকে শাস্তি দিতে হয়?

একটু অপ্রস্তুত হয়েই অনন্ত উঠে বসে। কাঁচা ঘুমের নেশা তখনো চোখমুখের ওপর ছাড়িয়ে রয়েছে। এলোমেলো চুল। অনন্তের মুখটা যমন সুন্দের তেমনি করুণ দেখায়।

তার চেয়ে করুণ হয়ে ওঠে প্রমীলার মুখ। — ছি ছি তুমি কাল রাত্রে খাওনি! আমাকে এত জব্দ করে তোমার কি সুখ হয় বলতো?

অনন্তের ক্ষুব্ধ অন্ধ মনটা যেন আবার চক্ষুষ্মান হয়ে ওঠে। আবার তার ছোট সংসারের হৃদয়টার চেহারা নতুন করে চোখে পড়ে। সেই ছোট সমুদ্রের মতই তো, সেই নীল জল আর কত ঢেউ। প্রমীলার চোখ দুটো ছলছল করে, তবুও হাসছে, নীলজলের ওপর চাঁদের আলোর মতন। এই তো, সব চেয়ে সত্য যা, তা একেবারে মুখোমুখি দেখা যাচ্ছে।

প্রমীলা অনন্তরামের গলা জড়িয়ে ধরলো—ওঠ, ওঠ, এত রাগ করতে নেই, লোকে দুষমনের ওপরেও এত রাগ করে না।

প্রমীলার নজরে পড়লো তুলসীদাসের রামচরিতখানা সামনে পড়ে রয়েছে। বইটা খোলা। প্রমীলা বইটা বন্ধ করে দূরে সরিয়ে রাখলো। অনুযোগের সুরে বললো—এই বইটাই তো আমার দুষমন্।

অনন্তরাম চম্‌কে প্রমীলার দিকে তাকায়। প্রমীলা কিছুমাত্র অপ্রতিভ হয় না। বরং তার প্রতিবাদ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে—আমার হাতের তৈরি খাবার খেতে তোমার মনে পড়লো না, আমাকে একবার ডাকলে না। সারা রাত তুলসীদাসের দোঁহা খেয়ে পেট ভরিয়েছ। আর এসব চলবে না বলে দিচ্ছি।

অনন্তরাম বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল—তাহলে কি হবে?

প্রমীলা—তাহলে আমিও আমার শিবালয় নিয়ে থাকবো।

অনন্তরাম আশ্চর্য হয়ে বললো—শিবালয়? কোথায় তোমার শিবালয়?

প্রমীলা—কৈলাস ভাইয়া বলেছে, আমার জন্যে ছোট একটি শিবালয় তৈরি করে দেবে। কত আর টাকা লাগবে? তুমি যদি না দাও, কৈলাস ভাইয়া দেবে।

অনন্তের মুখটা ধীরে ধীরে নিস্প্রভ হয়ে আসতে থাকে। রহস্যটার

কোন অর্থভেদ করতে পারে না। কবে এত শিবভক্ত হয়ে উঠলো প্রমীলা? কৈলাসই বা কবে থেকে এত শিবের মহিমা উপলব্ধি করে ফেললো?

প্রমীলা বললো—কথা বলছো না যে?

অনন্ত—আমার বলবার কিছু নেই।

প্রমীলা—তাহলে আমার শিবালয় তৈরি করে দিচ্ছ?

অনন্ত—আমার সাধ্য নেই।

প্রমীলা—বেশ, তাহলে কৈলাস ভাইয়াকে বলি।

অনন্ত প্রমীলার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টি:ছড়িয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। একসঙ্গে যেন কয়েক শত প্রশ্ন সেই দৃষ্টির ভেতর সুতীক্ষ্ণ শরের মত ছুটাছুটি করছে। একটু শান্তভাবেই বললো—শিবালয় চাও শিব-পূজার জন্য, না শিবজীকে অপমান করার জন্য?

প্রমীলা—এ কিবকম কথা হলো?

অনন্ত—বেচারা রামচন্দ্রজীর ওপর রাগ করেই কি শিবের পুজো ধরবে?

প্রমীলা চুপ করে রইল। অনন্ত বললো—এরকম ভুল করো না প্রমীলা। রামজী হোক বা শিবজী হোক, মন থেকে যাঁকে চাও, তাঁরই পুজো কর। কিন্তু আমার ওপর রাগ করে কিংবা...।

প্রমীলা—কিংবা, কি?

অনন্ত—কিংবা কৈলাস শিখিয়ে দিয়েছে বলেই তোমার শিবালয়ের সখ যদি হয়ে থাকে, তবে...

প্রমীলা একটু বেশী মাত্রায় উত্তপ্ত হয়ে উঠলো—কৈলাস ভাইয়া শিখিয়ে দিলেই কি শিবজী খারাপ হয়ে গেল? কি এমন খারাপ কাজের কথা বলেছে?

অনন্ত—কিন্তু কৈলাস কি সত্যিই...

প্রমীলা চোখ বড় বড় করে একটু বিদ্রুপের ভঙ্গীতে বললো—বুঝেছি, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তোমার মতে কৈলাস একটা মানুষই নয়। সে কি আর শিবভক্ত হতে পারে?

অনন্ত—কিন্তু সেদিনও তো দেখেছি কৈলাসের মুখে মদের গন্ধ।

প্রমীলা যেন দৃপ্তভাবে উত্তর দেয়—হ্যাঁ, তোমার কথা সত্যি। কিন্তু সে কৈলাস আর নেই। সে আর মদ খায় না।

অনন্তকে আরও আশ্চর্য করে দিয়ে প্রমীলা ঘরের ভেতর চলে গেল এবং পরমূহূর্তে কতগুলি ছোট ছোট স্তোত্রের বই আর একটি বড় বই সশ্রদ্ধভাবে তুলে নিয়ে এসে অনন্তের সামনে রাখলো।—এই দেখ শিবসংহিতা, আর এইগুলি সব স্তোত্র আর ভজন।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল অনন্ত। তার সংশয়ভরা প্রশ্নের পাহাড়টা নিজের মিথ্যায় চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কৈলাস আর সে-কৈলাস নয়। বোধ হয় প্রমীলা আর সে প্রমীলা নয়। সত্যি সত্যি জীবনের ধূলিকে এক নতুন বিশ্বাসে ভিজিয়ে দিয়ে ওরা শিবালয়ের পথটি তৈরি করে ফেলেছে। কৈলাসের মতন মানুষ যে-দেবতার জন্য মদ ছেড়ে দিয়ে আত্মশুদ্ধি করেছে, সে-কৈলাসের নিষ্ঠাকে ও ত্যাগের মূল্যকে ছোট করবার মত সাহস খুঁজে পায় না অনন্ত।

অনন্তের চোখে পড়ে, প্রমীলার মাথায় বিনুনী নেই। এলোমেলো রুক্ষ চুল ছিন্ন স্তবকের মত ছড়িয়ে রয়েছে। সেই টিপ আলতা পান, গয়না আর রঙীন ওড়নার সমারোহ থেকে যেন বিদায় নিয়ে প্রমীলার মূর্তিটা রক্তশূন্য ও সাদাটে হয়ে গেছে।

তবে কি সত্যি সত্যিই যাত্রা সুরু হয়ে গেছে? তবে কি অনন্তের সংসারে শুধু রামচরিত মানসের দোঁহাগুলিই চিরকাল গম্ভীর স্বরে বাজতে থাকবে? ক্রীড়াচঞ্চল শিশু-রামের দুষ্টু পায়ের নূপুর এ-ঘরের

আঙিনায় কখনো যে বেজে উঠবে, তার কোন আকাঙ্ক্ষার ছায়া নেই প্রমীলার মুখে। এক মহাশ্বেতার উদাস ছায়ামূর্তি প্রমীলাকে যেন অগোচর থেকে ইঙ্গিতে আহ্বান করেছে। প্রমীলা সরে যাচ্ছে। ওর আত্মা শুধু উপোষ করে থাকতে চায়।

এই সাধনায় প্রমীলা একা নয়। কৈলাসের সাধকতা আর উপদেশের গুণেই এই নতুন শুচিতা লাভ করেছে প্রমীলা। ভারতে গিয়ে সব গোলমাল হয়ে যায়। সমস্ত ঘটনাটা আরও জটিল হয়ে পড়ে। যেন তার ছোট সংসারে রামের কৃপা আর শিবের বরে এক অদ্ভুত সংঘর্ষ বেঁধেছে। কিন্তু বাধ্‌বার কথা তো নয়, শাস্ত্রেও একথা বলে না।

অনন্ত জিজ্ঞেস করে—কৈলাস কি আজ আসবে?

প্রমীলা—না, আজ তার সারাদিন উপোস। গয়া গেছে, কাল ফিরবে।

অনন্ত—কৈলাসের কারবার?

প্রমীলা—কারবারে আর মন নেই কৈলাস ভাইয়ের। ট্যাক্সিটাকে অন্য লোকের কাছে ঠিকে দিয়ে দিয়েছে।

কিছুক্ষণ যেন সমধিস্থের মত চুপ করে বসে থাকে অনন্ত। ডাকগাড়ি পৌছে গেছে, বাইরে হর্ণ বাজছে। প্রমীলা অনন্তের হাত ধরে আর একবার আগ্রহ করে টানলো—ওঠ, না খেয়ে রয়েছ। কিছু খেয়ে নাও। তাড়াতাড়ি কর, আমার অনেক কাজ আছে।

অনন্ত—কি কাজ তোমার?

প্রমীলা—আজ আমারও উপোস। গয়া থেকে যতক্ষণ না প্রসাদ আসবে, ততক্ষণ উপোস করে থাকতেই হবে। এরই মধ্যে পূজোর যোগাড়ও করে রাখতে হবে।

কৈলাস ভাইয়া নামে ও কাজে সত্যিই ভাই। নিকট-সম্পর্কে

সে অনন্তরামের ভাই দূর-সম্পর্কে প্রমীলারও ভাই। কিন্তু এই সম্পর্কের চেয়ে অনেক বড় তার আচরণ। কোথাও ফাঁকি নেই, নিজের সম্বন্ধে তার ধারণা রীতিমত ছোট।

জেলা বোর্ডের আঁকাবাঁকা অফুরাণ পথের পীচঢালা আবেগের মত কৈলাসের ট্যাক্সি হু হু করে দৌড়ে গড়িয়ে চলে যায়—উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে। কখন্ যায় কখন্ আসে কোন ঠিকঠিকানা নেই। ওর স্থিরতা নেই, নিশ্চয়তা নেই। কৈলাসের জীবনটা যেন পথে পথে ছুটাছুটি করেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। বিশ্রাম নেবার মত কোন কঠিন ঠাঁই আজও সে খুঁজে পায়নি। আসুক ঝড় বা বর্ষা, মধ্যাহ্নের সূর্য জ্বলে উঠুক মাথার ওপর, শীতের হিম আর কুয়াশায় আড়ষ্ট হয়ে যাক্ সারা শালবন—কৈলাসের ট্যাক্সির কোন ভাবনা চিন্তা নেই। হঠাৎ হর্ণ বাজিয়ে, দীর্ঘ দৌড়ের মত্ততায় গোঁ গোঁ করে অরণ্যের বুক চিরে ছুটে আসে এই পথের মোড়ে ক্ষণিকের জন্য বেগ একটু মন্দ হয়, তার পরেই আবার উধাও হয়ে যায়।

মোড়ের ওপর মাঝে মাঝে কৈলাসের ট্যাক্সি থামতো। কৈলাস কখনো গাড়ি থেকে নামতো না। গাড়ির ওপর বসে বসেই চেঁচিয়ে একটা ডাক দিত—কেমন আছ অনন্ত দাদা ?

হেসে ইসারায় জবাব দিত অনন্ত—ভাল আছি।

অনন্ত জানে কৈলাস কখনো গাড়ি থেকে নেমে কাছে আসবে না। কৈলাসের গাড়ির ট্যাঙ্কি যেমন পেট্রল ভর্তি তেমনি ওর পেট মদ আর তাড়ি টলমল করছে।

অনন্ত জানতো, ডাকলেও কাছে আসবে না কৈলাস। কৈলাস জানে, অনন্ত ডাকলেও সে তার কাছে যেতে পারে না ; বড় সাদাসিধে সাত্ত্বিক মানুষ অনন্ত দাদা। ঐ ছোট দোকানের দেড়-দু'টাকার বিক্রি, পিপাসা-

তের জলদান আর রামচরিত মানসের আনন্দে মজে আছে অনন্ত। কেমন একটা শুদ্ধ মনুষ্যত্ব। সজ্জনতা আর শুচিতায় অনন্ত দাদা একটু অসাধারণ হয়ে আছে। মদের ঢেঁকুর তুলে এমন মানুষের কাছে এগিয়ে যেতে পারে না কৈলাস, এটা তার নিজের বিবেকেরই বাধা।

অনন্ত এক-একবার ভোরে উঠে দেখেছে, পথের ওপর গাড়ি থামিয়ে, দারুণ শীতের রাত্রিটা গাড়ির সীটের ওপরেই নিরাশ্রয় কুকুরের মত ঘুমিয়ে পার করে দিয়েছে কৈলাস, তবু অনন্তের ঘরে এসে আশ্রয় নেয়নি। অনন্ত রাগ করে ধমক দিয়েছে, অনুযোগ করেছে। কৈলাস হেসে চুপ-করে থাকতো।

কৈলাসের ট্যাক্সী নতুন সরাইয়ের পথের ওপর অনেকবার থেমেছে আবার চলে গেছে! কিন্তু কিছুদিন আগে একবার থামতে গিয়ে যেন কিছুক্ষণের জন্য স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। দুপুরে এসে, চলি চলি করেও চলে যেতে অনেক দেরী হয়ে গেল। রাত্রি হয়ে গেল। অনন্তরামের ঘরেই খাওয়া দাওয়া সারলো কৈলাস। এই প্রথম!

এই প্রথম দেখলো কৈলাস—প্রমীলা বহিন আজকাল এখানেই থাকে।

তারপরেই আবার অনেক দিন কৈলাসের দেখা নেই। প্রমীলা হঠাৎ একদিন জিজ্ঞেসা করে—কৈলাস ভাইয়ার খবর কি? আর যে একদিনও এল না।

অনন্ত বলে—রোজই তো ওকে দেখতে পাই।

প্রমীলার অশ্চর্য হয়—কোথায়?

অনন্ত—এই পথেই যায়, রোজই ওর ট্যাক্সী যায়।

প্রমীলা চেহারাটা ঈষৎ বিষণ্ন হয়ে পড়ে। একটা উদাস নিশ্বাসকে লুকিয়ে ফেলবার জন্যই যেন বলে ওঠে—রোজই যায়, তবুও আসে না।

অনন্ত—কি ক'রে আসবে বল? যা ভয়ানক মদ খায়! এই

লজ্জাতেই আসতে পারে না। বড় দুঃখ হয় ওর জন্য। সবই তো ভাল,—দেখতে শুনতে ভাল, পয়সাও ভালই রোজগার করে কিন্তু ঐ কতগুলি পাপ ঢুকেছে। একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।

এত স্পষ্ট করে শুনেও সমস্ত ঘটনার ঘৃণাগুলিও যেন হঠাৎ একটা মমতার ছোঁয়ায় আরও হেঁয়ালি হয়ে ওঠে। আকাশের সূর্যটা যেন ক্ষণিকের দুঃখে নিভে যায়, জেলা বোর্ডের সড়কটা অন্ধকারের চাপে মুছে যায়। আর পথ দেখা যায় না। কৈলাসের আসা-যাওয়া বোধ হয় চিরদিন এই অন্ধকারের আড়ালেই দূরে সরে থাকবে।

কিন্তু অনন্ত জানে না, প্রমীলাও কল্পনা করতে পারেনি, এই আসা-যাওয়ার পথটুকু অটুট রাখার জন্যেই কৈলাস তখন যেন সবার অগোচরে সরে গিয়ে এক কঠোর তপস্যা করছে, মদ ছাড়বার চেষ্টা করছে। গয়া থেকে আসতে আসতে তিনবার মদের বোতল মুখের কাছে তুলে ধরে তিনবার হাত কাঁপে, নিজেকে হুঁসিয়ার করে। তারপর আর মদ খেতে পারে না। বোতলটাকে ছুঁড়ে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দেয়।

ঝড়ের মত ট্যাক্সি নিয়ে ছুটে চলে কৈলাস। নতুন সরাই এগিয়ে আসে। গাড়ীর গতি আকারণে মন্থর হয়ে আসে। নতুন সরাই পৌঁছবার আগেই একবার হঠাৎ থেমে যায়। কিছুক্ষণ ছটফট করে কৈলাস, তারপর আর সামলাতে পারে না। একটা মদের বোতল মুখের কাছে তুলে ধরে' ঢক্ ঢক্ করে খায়।

কৈলাসের প্রতি শোণিত কণায় ও স্নায়ুতে যেন নিজের দীনতার লজ্জাও পালিয়ে যাবার নেশা চন্‌চন্ করে ওঠে। আবার স্টার্ট নিয়ে জোরে এক্সিলেটার চাপে কৈলাস। নতুন সরাইয়ের মোড়টুকু কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে পার হয়ে চলে যায়। অনন্ত দোকানে ঘরের চৌকিতে বসে দেখতে পায়—ঐ, কৈলাস চলে গেল।

নতুন সরাইয়ের ধূলোর ছোঁয়াচ বাঁচাবার জন্যই যেন কৈলাস এভাবে পালিয়ে যায়। কৈলাসের অদ্ভুত কাণ্ড কারখানা দেখলে তাই মনে হয়। কিন্তু অনন্ত জানে না, প্রমীলা জানে না, নতুন সরাইয়ের মাটিতে স্থির হয়ে দাঁড়াবার জন্য, জীবনের যত উদভ্রান্ত পথিকতার যাতনার মধ্যে এক সত্যিকারের বিশ্রান্তির গ্যারেজ খুঁজে বেড়াচ্ছে কৈলাস। একটা যোগ্যতার লাইসেন্স চাই, যেন তারই জন্য বড় কঠিন ট্রায়াল দিচ্ছে কৈলাস।

দূর গয়া রোডের ধারে, নতুন সরাইয়ের মোড়ে অনন্তের দোকান ঘরে বাতি জ্বলে। ওদিকে ধানবাদ ষ্টেশনের ট্যাক্সী ষ্ট্যাণ্ডে গাড়ীর পর্দা ফেলে দিয়ে পেছনের সীটের উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করে কৈলাস। মদ ছোঁয় না। নিকটেই বাজারের বীভৎস গলি-গুলির ভেতর ছোট ছোট কালিমাখা ল্যাম্পের পাশে এক একটা মেয়েমানুষের শরীর এখনো ফাঁদ পেতে সাগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা আশা করে আছে এখুনি কৈলাস ওস্তাদ আসবে এই পথে। কিন্তু রাত গভীর হয়, ওস্তাদ কৈলাস আসে না।

গাড়ীর ভেতর উসখুস করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে কৈলাস। ভোর হয়। হাত মুখ ধুয়ে মুসাফিরখানায়, চায়ের দোকানে বসে পর পর চার কাপ চা খায় কৈলাস।

যেন রোগ থেকে সেরে উঠছে কৈলাস। এইবার যেন চোখ খুলে তাকাতে পারা যায়। তাকালেই পথ চেনা যাবে। যে'কটা যাত্রী পাওয়া যায়, ভাড়া যা-ই দিক্—এখুনি একটানা দৌড় দিয়ে সোজা পৌঁছে যাওয়া যায় নতুন সরাই। অনন্ত যদি ডাকে, সাড়া দিতে আর কোন বাধা নেই। হয়তো এইবার এগিয়ে যেতেও পারা যায়।

কৈলাসের ট্যাক্সী যাত্রী নিয়ে ছুটতে থাকে। বেলা বাড়ে, রোদ

চম্‌কায়, বরাকর নদীর শুষ্ক বালিয়াড়ীতে অভ্রের রেণু ঝিক্‌ঝিক্ করে। রামভক্ত সাত্বিক মানুষ অনন্ত এতক্ষণে পূজো সেরেছে, পাঠ শেষ করেছে, পথের পিপাসীদের জলছোলা খাওয়াবার প্রথম পালা শেষ করেছে। নতুন সরাই এসে পড়ে।

হঠাৎ কি ভেবে গাড়ীর স্পীড বাড়ীয়ে দেয় কৈলাস। না, থামাতে পারা যাবে না। কোন লাভ নেই। অনন্তের ঘরটা বড় বেশী পবিত্র। কোন ধুলো নেই, ধোঁয়া নেই। যেন দেবতাদের সঙ্গে বসে আছে অনন্ত। স্নান না করে, শুদ্ধ না হয়ে ওখানে কোন মতেই যাওয়া উচিত নয়। তা না হলে অনন্তকে যেন অপমান করা হয়।

শুধু অনন্তকে কেন, প্রমীলাকেও অপমান করা হয়। সত্যি ওরা দু'জন রাম সীতার মত। যেন ইচ্ছে করেই এই গরীবানার বনবাস গ্রহণ করেছে। অনন্তের মনটা এত নিষ্কলঙ্ক, এত সাদা—তাই তো প্রমীলা এত রঙীন। সকল মালিন্যের প্রবেশ নিষেধ এখানে।

তা ছাড়া, কৈলাস আজ বিশ্বাস করে, একা একা অনন্তের ঘরে ঢুকতে পারা যাবে না। এত শক্তি নেই তার। কোন দেবতার হাত ধরেই এগিয়ে যেতে হবে। নইলে অনন্তের ঘরের কপাট খুলবে না। খুললেও, এক মুহূর্ত টিকতে পারবে না কৈলাস।

ধুলো আর ধোঁয়ার একটি ছোট ঘূর্ণি ছুটিয়ে কৈলাসের ট্যাক্সী যেন তার সকল মালিন্যের পশরা নিয়ে পালিয়ে যায়।

অনন্ত প্রমীলাকে ডেকে আর একবার বলে—দেখলে কাণ্ড কৈলাসের আজও এল না।

প্রমীলা বলে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ?

অনন্ত—বল।

প্রমীলা—তুমি কি ওকে কখনো নিন্দে টিন্দে করেছ ?

অনন্ত—কখনো না। নিন্দে করবো কেন ? ও তো নিজের লজ্জায় নিজেই ভয়ে ভয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

প্রমীলা—চিরকাল কি এভাবে পালিয়েই বেড়াবে ?

অনন্ত—না। যেদিন রামজীর কৃপা হবে, সেদিনই সুস্থির হবে। সব ভুল বুঝতে পারবে।

রামজীর কৃপা নয়, মহাদেবের আশীর্বাদ পেয়ে গেল কৈলাস। গয়া পৌঁছে ধর্মশালার আঙ্গিনায় ট্যাক্সীটাকে রেখে দিয়ে পথে বের হলো। এক জোড়া গরদের চাদর আর ধুতি কিনলো। সহরের ভীড় ছাড়িয়ে যেন একটা সঙ্কল্পের আবেগে ধীরে ধীরে পথের পর পথ পার হয়ে বিরাট ফল্গুর বালিয়াড়ীর ওপর এসে দাঁড়ালো। অস্ত যাবার আগে পশ্চিমের সূর্য ঠাণ্ডা ও লালচে হয়ে উঠছে। বালিয়াড়ীর ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে এক জায়গায় এসে থামলো কৈলাস। দু'হাত দিয়ে বালি খুঁড়ে একটা গর্ত তৈরী করলো। যেন এতদিনের ধোঁয়া আর ধূলার জীবনের সমাধি খুঁড়ছে কৈলাস।

সূর্য্য ডুবে গেছে। চারিদিক আবছা হয়ে গেছে। কৈলাস হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলো, তার সমাধির কূপ এতক্ষণে ঠাণ্ডা জলে ভরে উঠেছে!

স্নান সেরে নিয়ে কৈলাস আবার ফিরে চললো। পথের ওপর একটা মন্দিরের সিড়ির কাছে আলো জ্বালিয়ে একটা লোক হরেক রকম ধর্মের বই বিক্রী করছিল। কৈলাস কিছুক্ষণ দাঁড়াল, কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপরই একখণ্ড শিবসংহিতা কিনে ধর্মশালার দিকে ফিরে চললো।

এর পর আর কৈলাসকে ডাকতে হয়নি। কৈলাসের ট্যাক্সী এসে নতুন সরাইয়ের পথের মোড়ে নিয়মমত থেমে গেছে। গাড়ী থেকে

নেমে সোজা অনন্তের ঘরে এসে বসেছে কৈলাস। গল্প হয়, তর্ক হয়, সন্ধ্যা পার হয়ে যায়। তবু কৈলাসকে বসে থাকতে হয়, যতক্ষণ না প্রমীলার রুটী তৈরী সারা হয়। রুটী-গুড় খেয়ে কৈলাস আবার চলে যায়।

এ পথে আসতে যেতে আর থাম্‌তে কোন বাধা নেই। এমন কি অনন্ত যখন ঘরে থাকে না, তখনো কৈলাস আনায়াসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখানে এসে বসে থাকতে পারে। সব ভীরুতার সঙ্কোচ পুরানো ধূলো আর ধোঁয়ার মতই উপে গেছে। কৈলাসের বুকের ভেতর সকল শূন্যতা এক মন্ত্রধ্বনির গুঞ্জরণে ভরে আছে।

কোন ভয় নেই কৈলাসের, কোন অপরাধের কুণ্ঠা নেই তার মনে। বড় কঠিন পরীক্ষা সহ্য করে, যোগ্য হয়ে, তৈরী হয়ে তবে সে এসেছে।

ধানবাদ ট্যাক্সী ষ্ট্যাণ্ডে আজও যাত্রীর অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় কৈলাসকে। কিন্তু এই সময়টুকুও বৃথা যায় না। সীটের পাশে শিবসংহিতাটী রাখা আছে। ষ্টিয়ারিংয়ের ওপর শিবসংহিতাখানা খুলে ধরে কৈলাস। মাথাটা ঝুঁকিয়ে এক মনে পড়তে থাকে।

কৈলাসের বেয়াড়া বিবেকটা যেন একেবারে জব্দ হয়ে গেছে। মনের এই ক্ষমাহীন দেবতাটি ভ্রুকুটি করে এখন আর একথা বলতে পারে না—অন্যায় করছো কৈলাস।

কৈলাসের অন্তর জুড়ে এক পরম আশ্বাসের বাতাস বইতে থাকে—হে স্মরহর, তুমি শ্মশানে খেলা ক'রে বেড়াও, পিশাচেরা তোমার সহচর, চিতাভস্ম তোমার অনুলেপ, নরকপালসমূহ তোমার মালা। তোমার আচরণ এই রকমই অপবিত্র। কিন্তু তবুও হে বরদ শিব যে তোমাকে স্মরণ করে তার কাছে তুমি মঙ্গল স্বরূপ!

কৈলাস আশ্চর্য হয়, এর চেয়ে আপন কোন্ দেবতা আছেন?

ঘৃণিতের হাত ধরে বুকে টেনে তুলবার জন্য তিনি স্বয়ং ঘৃণার সাজ পরেছেন। তবু ইনিই তো চন্দ্রোদ্ভাসিতশেখর, ইনিই তো গঙ্গাফেন-সিতাজটা! এমন দেবতা আর কে আছেন যাঁর নয়নে বহ্নি স্ফুরিত হয়।

চারিদিকের চাঞ্চল্য ও কলরবের মধ্যেও কৈলাস যেন এক নিবিড় প্রশান্তির আস্বাদে মুগ্ধ হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে শিবভক্তের মনের আকাশে একটা নতুন গর্বের ছটা জেগে উঠতে থাকে। রাম-সীতার যুগলরূপের মধ্যে কি এমন বিস্ময় আছে? ভয় পাবার, বিহ্বল হবার, হিংসা করার কি আছে? এর চেয়ে বড় রূপ কি আর নেই?

কৈলাসের বুকের শণিত হঠাৎ উষ্ণ হয়ে ওঠে। পৃথিবীর যেখানে যত যুগল মূর্তি আছে, তার সব রূপ রং আর আব আভরণ আজ চূর্ণ হয়ে যাক্। বড় শান্ত, বড় নিষ্ঠুর, বেমানান আর বে-আইনি এই মূর্তিগুলি। শুধু হরগৌরী ছাড়া আর কোন মিলনের মূর্তিকে আজ পূজো করতে চায় না কৈলাস।

কোথায় তুমি হরগৌরী, পার্বতী পরমেশ্বর! সেই অঙ্গে অঙ্গে বাঁধা রূপ। অর্ধঅঙ্গে কস্তূরীচন্দন, অর্ধঅঙ্গে শ্মশানভস্ম—অর্ধাঙ্গে মান্দারমালা, অর্ধাঙ্গে করোটিমালা—অর্ধাঙ্গে দিব্যাম্বর, অপরার্ধ উলঙ্গ। অর্ধাঙ্গ স্বর্ণ চম্পকের বর্ণ, অপরার্ধ কর্পূরধবল—অর্ধাঙ্গে মেঘশ্যামল কুন্তল, অপরার্ধে বিভূতি-ভূষিত জটা। শিবের অর্ধ এবং এবং শিবার অর্ধ নিয়ে রূপের ঈশ্বর এই মূর্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছেন।

প্রমীলা উপোষ করেই দিনটা কাটলো। রাতটাও উপোষে কাটলো। ভোর বেলা গয়া থেকে ফিরলো কৈলাস। হাতে একটা ঠোঙায় কতকগুলি ফুলবেলপাতা আর প্রসাদ। কৈলাসের কপালে একটা ছাইয়ের টিপ গরদের চাদর গায়। শালবনের মাথার ভীড় ঠেলে সূর্য মাত্র ওপরে উঠেছে, কৈলাসের মুখের ওপর আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

কী শাণিত পবিত্র ও ভাস্বর হয়ে উঠেছে কৈলাসের মূর্তিটা। সারা মুখটা ঝক্ঝক্ করছে। কৈলাসের দিকে তাকিয়েই অনন্তর বুকটা হঠাৎ ঢিপ ঢিপ করে উঠলো। কোথা থেকে একটা ভয়ার্ত স্পন্দন অনন্তের দেহমনে ঠেলে উঠছে—চেষ্টা করেও কিছুক্ষণের মত সুস্থির হতে পারলো না অনন্ত।

প্রমীলাও উঠে এসে বাইরে দাঁড়িয়েছিল। অনন্ত আবার ভাল করে দেখলো, প্রমীলার মাথার চুলগুলি কত রুক্ষ হয়ে উঠেছে। গায়ে কোন গয়না নেই, শুধু হাতে দুগাছি চুড়ি। প্রমীলার চেহারাটা যেন কৃশ হয়ে আরও প্রখর হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো এক নতুন অভ্যর্থনার আনন্দে চিক্ চিক্ করে হাসছে।

কৈলাস এগিয়ে আসছিল, অনন্ত এগিয়ে যাচ্ছিল। অনেকগুলি প্যাসেঞ্জার বাস মোড়ের ওপর এসে পৌছে গেছে। যাত্রীদের কলরব শোনা যায়।

কৈলাসের দিকে তাকিয়ে অনন্ত একটু ব্যস্তভাবেই বললো—শুনলাম, কাল থেকে উপোষ করে রয়েছ। একটু জিরিয়ে নাও, না খেয়ে দেয়ে চলে যেও না।

কথাগুলি বলেই অনন্ত যেন ছট্‌ফট্ করে দৌড়ে চলে গেল। মোড়ের কাছে পৌছে তার প্রিয় জলসত্রটির কাছে দাঁড়ালো। একটা ঘটিতে জল ঢেলে নিয়ে তৈরী হলো অনন্ত।

তৃষ্ণার্তেরা একে একে ছুটে আসছে। বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী। কেউ অঞ্জলি ভরে জল খায়। কেউ পাত্রপূর্ণ করে নিয়ে চলে যায়। কেউ বা সাহস করে পা ধোয়ার জন্য লজ্জিতভাবে একটু জল চায়। অনন্ত এক ঘটি জল নিয়ে তার পায়ের ওপরেই ঢেলে দেয়। লোকটি অপ্রস্তুত হয়ে পা সরিয়ে নিয়ে কুণ্ঠিতভাবে বলে—থাক্ থাক্। অনন্ত বলে —নাও, আর একটু জল নাও ভাল করে ধোও।

একটা জয়ধ্বনির উল্লাস। সকাল বেলায় শলেবনের শান্তি শিউরে দিয়ে একটা ব্যাকুল হর্ষ যেন দক্ষিণ দিক থেকে ছুটে আসছে। কৌতুহলী হয়ে অনন্তরাম দূর পথের বাঁকের দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু পরেই তাদের দেখা গেল। সড়কের ঢালু ধরে তারা যেন ঊর্ধলোক থেকে চলে আসছে। দল বেঁধে তারা আসছে। সম্মুখে একটা বড় পতাকা উড়ছে। দু'পাশে শালবনের সবুজ, পায়ের নীচে শিশিরভেজা কালো পীচঢালা পথ, মাথার ওপর নতুন রোদের আভা—তারই মধ্যে এই অভিযাত্রী জনতার খদ্দরের সাজ যেন শুভ্রতায় প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে।

মোড়ের যাত্রীরা চেঁচিয়ে উঠল—এসে গেছে এসে গেছে। এখানেও তুফান পৌঁছে গেল!

জনতা মোড়ের কাছে পৌঁছে গেল। বার বার জয়ধ্বনি করলো। সবাইকে ডাক দিল—চল চল, সবাই চল।

আজাদীর লড়াই সুরু হয়ে গেছে। জনতা এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলো না। একটা মরণপণ প্রতিজ্ঞা যেন ঝড় হয়ে ছুটে চলে গেল—তসীল কাছারীর দিকে। পরশাসনের যত গ্লানি আর গ্লানির চিহ্নকে আজ ওরা অগ্নিসাৎ করবে। এক যজ্ঞের আগুন জ্বালতে ওরা চলে যাচ্ছে।

জনতা চলে গেল। অনন্তরামের কাণে তখনো জনতার :ললিত কণ্ঠের গানের রেশ যাদুমন্ত্রের মত বাজছিল।—জান হাজির হ্যায় অগর্ কর্ দো ইসারা গান্ধী! হে গান্ধী, তুমি যদি মাত্র ইসারা কর, তাহ'লেই এ প্রাণ উৎসর্গ করতে আমরা প্রস্তুত আছি।

এ যে তার রামচরিতমানসের বাণী! কত বার কী নিবিড় বিশ্বাসে, কি শ্রদ্ধাললিত স্বরে এই আত্মদানের গান গেয়েছে অনন্তরাম।

হ্যাঁ, শুধু গান গাওয়াই সার হয়েছে। কিন্তু দেখে হিংসে হয়, এই জনতা যে নিজেরাই গান হয়ে গেছে। গান্ধীজী, গান্ধীজী—রামজীর

আত্মাটী বুঝি নতুন করে আবির্ভূত হয়েছেন। কী ভাগ্যবান তারা, যারা তাঁর পুণ্য স্পর্শ পেয়েছে, তাঁর বাণীতে আত্মহারা হয়ে গেছে ।

অনন্তরামের প্রতিদিনের অভ্যস্ত কাজের জীবনটা যেন আজকের ঝড়ে শুক্‌নো ডালপালার মত ভাঙ্‌বার আগে মড়্‌মড় করে বেজে উঠলো।

তবু কাজ করে যায় অনন্ত। মোটর বাস, মোষেরগাড়ী এসে মোড়ের ওপর থামে। পালকি থামিয়ে ক্লান্ত বেহারার দল হাঁপায় আর হাওয়া খায়। দোকানের চৌকীতে বসে অনন্তরাম বিক্রী করে—আটা ছাতু কেরোসিন কুইনিন, আমলকীর আচার, ভাস্কর লবণ, হরধনুর্ভঙ্গের ছবি। এই বিকিকিনির তুচ্ছ সংসার ক্রমেই নিরাস্বাদ হয়ে আসছে, মোটেই ভাল লাগে না। তবু যেন অন্যমনস্কের মত এই ধরাবাঁধা কাজের ওপর শুধু হাত ছুঁইয়ে চলে যায় অনন্ত, শুধু নিজের মনকে হাতের কাছে পায় না।

জীবনে এই প্রথম, এক নিঃস্বতার অভিমানে অনন্তরামের চিরকেলে আশা-বিশ্বাসের সত্তাটি যেন কুণ্ঠিত হয়ে রইল। রামচরিত মানস তো পরশমণি, যার ছোঁয়ায় সব ভাবনা সোনা হয়ে যায়। কিন্তু কই? মন যে তার ধূলো হয়ে ঝরে পড়ছে। যেন ঘূণ ধবে গেছে।

কংগ্রেস জিন্দাবাদ! আর একটা জয়রোলের স্রোত পথের ওপর আচম্‌কা কোথা থেকে এসে গড়িয়ে পড়ে। বিহ্বলের মত অনন্তরাম পথের মোড়ে তাকিয়ে থাকে, জনতার উল্লাস যেন নতুন সরাইয়ের সকল দীনতার ধূলিসজ্জাকে মুছে দিয়ে চলে যায়। ধীরে ধীরে মোড়ের ওপর একটা ভীড় জমে উঠতে থাকে। অনন্ত দেখতে পায়—ঐ রঘুনাথ আহীর, ঐ বুড়ো মাহাতো কাশীনাথ। ঐ যে তাদেরই সঙ্গে রাজপুত বাড়ীর সব ছেলেগুলিই এসে দাঁড়িয়েছে। আরও আসছে। কী অদ্ভুত কাণ্ড! যেখানে শুকনো ডাঙ্গা ছিল, হঠাৎ কোন্ প্লাবনে সেখানে যেন জলে ভরে উঠলো। আরও দেখতে পাওয়া যায়, সেই জলে ঢেউ জাগছে, মত্ত ফেনিল

ঢেউ। নয়াসরাইয়ের জনতা নীল আকাশের দিক হাত ছুঁড়ে জয়ধ্বনি করলো—স্বতন্ত্র ভারত কি জয়!

অনন্তরাম জানে, লড়াই সুরু হয়ে গেছে। কিন্তু কী মনোমোহা এই লড়াইয়ে রূপণ! স্তবে গানে শুচিতায় ও শুভ্রতায় এক অনুপম উৎসরের মত।

অনন্তরাম তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সেরে ফেলতে চায়। ওরা যেন চলে না যায়। একটু অপেক্ষা করুক। আর কিছুক্ষণ। আর একটু সময় দিক অনন্তরামকে। মন স্থির করে নিক্ অনন্তরাম। কিসের এক ভিরুতায় কেমন এক লজ্জায় কতগুলি একেবারে নতুন অভিমানে ও মায়ায় তার মন আজ এই ঘরের ভেতবেই যেন হারিয়ে গেছে। ছুটে চলে যাবার আহ্বানও পৌঁছে গেছে, সম্মুখে কোন বাধা নেই। এক অবারিব ও আলোকিত পথ। তবু......

তবু পেছন থেকে যেন একটা অন্ধকাবের শিকল অনন্তরামের পাদুটোকে জড়িয়ে ধবেছে। প্রমীলাকে চিনতে পারা গেল না, আরও দুর্বোধ্য কৈলাস। আজ ওরা শুধু একবার অনন্তবামের সম্মুখে এসে দাঁড়াক্, স্পষ্ট করে নিজের মুখেই বলে দিক, ওরা কে? তারপর আর কোন বাধা থাকবে না অনন্তরামের। পথের মোড়ে ত্রিবর্ণ পতাকা দুলছে, এক দৌড় দিয়ে এই রঙ্গীন যুদ্ধের আঙিনায় ছুটে চলে যেতে পারে অনন্ত।

ঘরের ভেতর থেকে ব্যস্তভাবে বের হয়ে এল প্রমীলা—ভাল ধূপ আছে?

অনন্ত—কেন?

প্রমীলা—পাঠ সুরু হয়েছে, ধূপ শেষে হয়ে গেছে, আরও চাই।

অনন্ত—কিসের পাঠ?

প্রমীলা—কৈলাস ভাই শিব স্তোত্র পড়ছে। তুমিও এস, একবার শুনে যাও, কি সুন্দর পড়ছে কৈলাস ভাই।

এক মুঠো ধূপ তুলে নিয়ে প্রমীলার দিকে এগিয়ে দিল অনন্ত। তার পরেই অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ধূপ হাতে নিয়ে ব্যস্তভাবে চলে যেতে গিয়েই প্রমীলা থমকে দাঁড়ালো। এক পা দু'পা করে এগিয়ে এসে অনন্তরামের একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। অনন্ত আশ্চর্য হয়ে প্রমীলার দিকে মুখ ফেরাতেই দু'হাতে দিয়ে মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরলো প্রমীলা—এত গম্ভীর হয়ে বসে আছ কেন? কি হয়েছে?

অপরাধীর মত সঙ্কোচে হঠাৎ বিব্রত হয়ে অনন্ত উত্তর দিল—না না, সত্যই কিছু হয়নি।

প্রমীলা হেসে হেসে চোখ দু'টো বড় করে নকল শাসনের ভঙ্গীতে বললো—সত্যি বলছো তো?

অনন্ত—হ্যাঁ।

ব্যস্তভাবেই আবার ঘরের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল প্রমীলা।

ধীরে ধীরে একটা স্বাচ্ছন্দ্যের টানে কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে পায়চারী করে অনন্ত। বুকের ভেতর যেন এতক্ষণ একটা নির্লজ্জ অবিশ্বাসের বাতাস আটকেছিল। মনের কপাট খুলছে, বদ্ধ হাওয়ার গ্লানি উড়ে সরে যাচ্ছে। প্রমীলাকে একবার ডাকতে ইচ্ছে করছিল অনন্তরাম।

কেন?

প্রশ্ন করলে এখনো ঠিক উত্তর দিতে পারবে না অনন্ত। নিত্য দোকানদারীর স্থাবর জীবন যেন নিছক সুস্থিরতার পাপে মরচে ধরে গেছে। ওদিকে রামচরিতের সব মহিমা আজ পুঁথির বন্ধন ছিঁড়ে হিন্দুস্থানের আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। ঐ শালবনের চঞ্চল

সবুজে, ঐ ঘূর্ণিহাওয়ার আবেগে, ঐ জয়ধ্বনির গর্বে। প্রমীলাকে একবার আশীর্বাদ করতে চায় অনন্ত।

কেন ?

এখনো স্পষ্ট বুঝতে পারে না অনন্ত। মোড়ের ওপর জনতার সামনে দাঁড়িয়ে রাজপুতবাড়ীর সব চেয়ে ছোট ছেলেটা বক্তৃতা করছিল—এই ঝণ্ডা আর এই বুক, এই আমাদের সম্বল। বাস্ এইবার আমরা রওনা হয়ে যাই। এই ঝণ্ডার গায়ে আমাদের বুকের রক্তের ছিটে লাগবে। স্বরাজ নিতে হবে, আজ প্রাণের হিসাব করতে নেই। চলো চলো চলো......।

চলে যেতেই হবে। অনন্তরাম যেন এতক্ষণে মনের ভেতর একটা প্রশ্নের উত্তর শুনতে পায়। কিন্তু, কিন্তু আরও অনেক প্রশ্ন যে রয়ে গেল। এখনো উত্তর পাওয়া গেল না।

যাবার আগে রামচরিতখানা আর একবার কোলের উপর তুলে নিল অনন্তরাম। যাত্রায় আগে যেন এক রত্নপেটিকা খুলে তার পথের সম্বল বেছে বেছে তুলে নিচ্ছে।

গুন্ গুন্ করে পড়তে থাকে অনন্ত, যেন একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন সুর।

রাম সিন্ধু ঘন সজ্জন ধীরা
চন্দন তরু হরি সন্ত সমীরা

রামচন্দ্র তুমি সমুদ্রের মত, সজ্জনেরা মেঘ। হে রাম তুমি চন্দন তরু, সজ্জনেরা বাতাস।

হ্যাঁ, মোড়ের উপর জনতার মূর্তি প্রতিজ্ঞায় গম্ভীর হয়ে উঠেছে—ওরা মেঘের মত। হ্যাঁ, কোথাও যেন চন্দন তরুর মাথায় ঝড়ের মন্ত্র লেগেছে, ওরা বাতাস হয়ে ছুটে যাচ্ছে !

মনে মনেই প্রমীলাকে আশীর্বাদ করে অনন্ত। তাকে চিনতে পারেনি অনন্ত, বড় ভুল হয়েছিল। মন বড় নোংরা হয়ে গিয়েছিল।

বড় অহঙ্কার ছিল মনে মনে। আজ হৃদয়ের সব বিশ্বাস সঁপে দিয়ে অনন্ত পড়তে থাকে।

ভয়উ মনোরথ সুফল তব
শুনু গিরিরাজকুমারী
পরিহরু দুসহ কলেস সব
অব মিলিহহিঁ ত্রিপুরারি।

গিরিরাজকুমারী শোন, তোমার ইচ্ছা সফল হয়েছে। এখন সকল দুঃসহ ক্লেশ ছেড়ে দাও, শিবকে পাবে।

তাড়াতাড়ি পুঁথির পাতার পর পাতা উল্টে যায় অনন্ত। রামজীর কৃপা যেন তার জীবনে এতদিনে সত্য হয়ে উঠেছে। সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে, সব সংশয় একে একে দূরে সরে যাচ্ছে।

...ভরত হৃদয় সিয়া রাম নিবাসু
এহঁ কি তিমির জহঁ তরণি প্রকাসু

ভাই ভরতের হৃদয়ে সীতারাম বাস করে। সেখানে সূর্য আছে, সেখানে কি অন্ধকার থাকতে পারে?

কৈলাস ভাই! আবেগ রোধ করতে না পেরে চেঁচিয়ে, ডাক্তে যায় অনন্ত। ছি, ছি, কী ভয়ানক ভুল, কী নোংরা মনের প্রবঞ্চনা! ভাই ভরতকে এতদিন চিনতে পারে নি অনন্ত।

অনন্তের চেয়ে বেশী সুখী কেউ নেই। তার সীতা আছে, ভরত আছে। অন্ধ হয়েছিল বলে এতদিন দেখতে পায়নি, তার ছোট সংসারে রামচরিতের পুণ্য জীবন্ত হয়ে রয়েছে।

করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে! পথের মোড়ে আর একটা ধ্বনি, আর একটি জনতা, আর একটা নতুন জলপ্রপাতের হর্ষ!

অনন্তরামের গলার সুরও নতুন এক আবেগের বন্যায় একেবারে ভেসে যায়।

...রাম কাজ কারণ তনুত্যাগী
হরিপুর গয়উ পরম বড় ভাগী।

রামের কাজে জীবন বলি দাও। তুমি হরিধামে যাবার মত পরম ভাগ্য লাভ করবে।

রামচরিতথানা বন্ধ করে রেখে দোকানের চৌকী থেকে একটা লাফ দিয়ে নেমে পড়ে অনন্ত। খড়ম জোড়া পরে নিয়ে সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে দৌড় দেয়। পথের মোড়ে পৌঁছে যায়। ত্রিবর্ণ পতাকার প্রমত্ত ছায়া অনন্তরামের মাথার ওপর যেন এক চরম আবদারের দাবীতে হুটোপুটি করতে থাকে।

শিবপুরাণের একটা অধ্যায় পড়ছিল কৈলাস। ঘরের ভেতর একটা জায়গা পরিষ্কার করে নিকিয়ে দিয়েছে প্রমীলা। তারই ওপর আসন পেতে কৈলাস শান্তভাবে বসেছিল। সামনে একটু তফাতে মুখোমুখি বসেছিল প্রমীলা। ঘরের ভেতর রোদের আলো এসে পড়েছে, তবু একটা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছিল। ধূপ পুড়ছিল। প্রদীপ শিখার চঞ্চলতায় একটা দুঃসহ পবিত্রতার জ্বালা যেন স্বর্ণাভ ছায়ার মত কৈলাসের চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছিল।

কৈলাস পড়ছিল—সেই মহাদেবই ভাস্কর, সেই মহাদেবীই প্রভা। এই শঙ্কর-শঙ্করীই আকাশ ও পৃথিবী, সমুদ্র ও বেলা, বৃক্ষ ও লতা......।

প্রমীলা হঠাৎ অনুরোধ করে—একটু থামুন কৈলাস ভাই। আমি এখনি আসছি।

পড়া থামিয়ে কৈলাস বলে—কেন ?

প্রমীলা ব্যস্তভাবে দাঁড়িয়ে বলে—জল ফুটছে, ডাল ছেড়ে দিয়ে আসি,

নইলে রান্না দেরী হয়ে যাবে। ডাকগাড়ী এসে গেলে ওর আবার খাবার সময় হবে না।

প্রমীলা চলে যায়। কৈলাস বইটা একেবারে বন্ধ করে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে! একমুঠো ধূপের গুঁড়ো, নিয়ে আগুণের সরার ওপর ছড়িয়ে দেয়। ভুর ভুর করে সুরভিত ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস আচ্ছন্ন হতে থাকে। কৈলাসের মূর্তিটা যেন তার মধ্যে অত্যন্ত অবাস্তব ও অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ পরেই ফিরে আসে প্রমীলা। নিজের জায়গাটিতে বসে। আগ্রহ করে বলে—পড়ুন।

শিবপুরাণের অধ্যায়টা খুঁজে বের করতে অনেক সময় লাগে কৈলাসের, হাতটা অকারণে কাঁপতে থাকে।

হঠাৎ প্রমীলার দিকে চোখ তুলে তাকায় কৈলাস। দৃষ্টিটা বড় প্রখর, শিবভক্তেরও চোখে যেন আগুনের আভা ঝলকায়।

কৈলাস বলে—শিবের আরাধনায় কোন ফাঁকি রাখতে নেই প্রমীলা।

তারপরেই পড়তে আরম্ভ করে কৈলাস—যিনি ভূমি নহেন, জল নহেন, আকাশ নহেন। যাঁর তন্দ্রা নেই, নিদ্রা নেই, গ্রীষ্ম নেই, শীত নেই। যাঁর দেশ নেই, ঘর নেই, সেই শিবকে……।

কৈলাসের গলার স্বর যেন এক কান্নার আবেগে ভেঙে পড়তে চায়। প্রমীলা স্থির দৃষ্টি তুলে দেখতে থাকে, পাঠ শোনে।

কৈলাস যেন ব্যাখ্যা করার জন্যই বলে—তার কিছু নেই প্রমীলা। সে একেবারে শূন্য।

প্রমীলা বলে—পড়ুন।

কৈলাস পড়ে—সে শুধু বিষপান করে, তাই সে নীলকণ্ঠ। সাপ তার গলা জড়িয়ে ধরেছে। তবু তারই বাম অঙ্গের শোভা হয়ে রয়েছেন স্বয়ং পার্বতী।

পড়তে পড়তে কৈলাস হঠাৎ থেমে যায়। অনেকক্ষণ মুখ নীচু করে বসে থাকে।

প্রমীলা বলে—পড়ুন।

কৈলাস তাকায় প্রমীলার দিকে। অন্তরের সমস্ত বিশ্বাস চরম আবেদনের মত ফুটে ওঠে; বুকভরা আগ্রহ নিয়ে কৈলাস ডাকে—কাছে এস প্রমীলা। পাশে বসো।

প্রমীলা সেইখানেই নিশ্চলভাবে ব'সে থেকে বলে—পড়ুন।

একটা ধোঁয়ায় পুঞ্জ কৈলাসের মুখের ওপর দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে উড়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসের মূর্তিটাকেও বদলে দিয়ে গেল। যেন কৈলাসের মাথায় আগুন ধরে গেছে। মুখটা একেবারে কালো হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টিটা নীরব হাহাকারের মত, এক রিক্ত জগতের চারদিকে অসহায়ের মত ছুটোছুটি করছে।

এত সেয়ানা শক্ত মানুষ কৈলাস যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। আবোল তাবোল বকছে—আমি শিবের পূজো কেন করি, তা আমি নিজেই জানি না প্রমীলা। বোধ হয় জীবনে কোন গৌরীর মূর্তিকে স্বচক্ষে দেখতে পাব, সেই লোভে.....।

প্রমীলার নিশ্চল মূর্তিটা যেন একটা আঘাত লেগে আচমকা নড়ে উঠলো। তার পরেই আবার স্থির হয়ে রইল।

কৈলাস বলে—দেবতা হোক্ আর মহাপুরুষ হোক, জীবনে কারও গৌরীলাভ হয় না জানি। মহাদেবও গৌরীর অর্ধেকটুকু পেয়েছিলেন প্রমীলা। আমি কোন ছার!

চিরকালের বোকা মেয়ে প্রমীলা চমকে উঠলো। মাথা হেঁট করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

কৈলাস যেন বুদ্ধিসুদ্ধি হারিয়ে একেবারে পাগল হয়ে গেছে—অনন্ত ভাইয়ের কাছে আমি কোন দোষ করতে চাই না প্রমীলা। তার কিছুই কাড়তে চাই না। আমি চোর নই।

মাথা হেঁট করেই ভয়ার্ত স্বরে প্রমীলা বলে—তবে আপনি কি ?

কৈলাস—আমি ভক্ত। সত্যিই আমি শুধু ভক্ত, প্রমীলা। শিব আমার ভরসা।

প্রমীলা—আপনার কথা বুঝতে পারছি না, কৈলাস ভাই।

কৈলাস—শুধু তোমার ভালোবাসার অর্ধেকটুকু প্রমীলা।

প্রমীলা মুখ তুলে তাকালো—কি বললেন ?

কৈলাস—আমার যেটুকু পাওনা, তাই বললাম।

প্রমীলা আর মাথা হেঁট করলো না। যেন একটা জ্বালার আঁচ লেগেছে, চোখ দুটো বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে প্রমীলা।

প্রমীলার চোখ নিংড়ে বড় বড় জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছিল। হঠাৎ ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়ালো কৈলাস। কোথায় গৌরী ? গৌরীরূপের কোন চিহ্ন নেই এই মেয়ের মুখে। আকুল হয়ে কাঁদছে, এ যে সীতার মূর্তি। অতি বোকা, অতি ছিচকাঁদুনে অথচ অত্যন্ত ঢিট মেয়ে সেই রামায়ণের সীতা।

একটা তাচ্ছিল্যের ঠেলা দিয়ে শিবপুরাণ পাশে সরিয়ে রাখলো কৈলাস, এই ব্যর্থ অপদার্থ মন্ত্রের জঞ্জাল। একটা ছলনার সিঁড়ি, মানুষকে ঝুটা দেবত্বের গাছে তুলে দিয়েই দূরে সরে যায়।

পালিয়ে যাবার আগে প্রমীলার সামনে একবার দাঁড়ালো কৈলাস। কৈলাসের হাত-পা কাঁপছে। শুধু একটা কথা বলার চেষ্টা করতে গিয়ে কৈলাস বুঝলো—গলা কাঁপছে।

আর মুহূর্ত দেরী করলে না কৈলাস। ভেতর ঘর থেকে বারান্দায়,

বারান্দা থেকে দোকান ঘর। তারপরেই ছোট মাঠের ওপর দিয়ে এক দমে হন্ হন্ করে হেঁটে পথের মোড়ে এসে পৌঁছিল কৈলাস।

একেবারে নির্জন হয়ে রয়েছে মোড়টা। কোন সাড়া শব্দ নেই। বস্তির ঘরগুলির কপাট বন্ধ। কোন গাড়ী দাঁড়িয়ে নেই, গাড়ীর চলাচলও নেই। নতুন সরাইয়ের জীবনের সাড়া যেন শালবন ভেদ করে দূরান্তরে পালিয়ে গেছে। এক বৈরাগীর ছাড়াভিটার মত নতুন সরাইয়ের শব্দমুখর পথের মোড় আরও গভীর শূন্যতায় উদাস হয়ে রয়েছে।

তসীল কাছারীর ফটকটা কেল্লার দরজার মত। কাছারীর চারিদিকে বেঁটে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। একটা কাঁচা সড়ক নানাদিক ঘুরে ফিরে ফটকের কাছে এসে শেষ হয়েছে, প্রাচীরে ঘেরা এই ভূখণ্ডের ওপর ছোট ছোট সবুজ ঘাসের আঙিনা আর কাছারী ঘর। শুধু তসীল কাছারী নয়, কাছাকাছি আশেপাশে এক সৌভ্রাত্রের আবেগে অনেকগুলি অফিস দাঁড়িয়ে আছে। একটা খাজনাখানা আর জঙ্গল অফিস, একটা আবগারী অফিস, একটা ডাকঘর। ছোট একটা কৃষি অফিসও আছে—একটা অকেজো ট্র্যাক্‌টরের মরচে-পড়া কঙ্কাল কাৎ হয়ে পড়ে আছে সম্মুখের ঘাসের ওপর। ফটক পার হয়ে প্রথম দালান হলো থানাবাড়ী। ছোট ছোট আফিস আর ছোট ছোট আমলা, কিন্তু খুব বড় বড় কাজ হয়। এক বছরের ঘুসের টাকা এক সঙ্গে জমা করলে ইঁটের বদলে তাই দিয়ে আর একটা পাঁচিল তোলা যায়। সার্কেলের পেয়াদাটার মুখে শুধু একটু খুসী মেজাজের হাসি ফুটিয়ে তুলতে হলেও চার আনা ঘুস দিতে হয়। কথা বলাতে আট আনা—আর দরখাস্তখানা টেবিলের ওপর পৌঁছে দিতে এক টাকা। কয়েকটা গাঁ ডিহি বস্তি আর সরাই, কয়েকটা জঙ্গল পাহাড় ঝর্ণা আর ক্ষেত, কয়েক হাজার দীন মানুষের পাপ-পুণ্য সুখ-দুঃখ শোক ও উৎসবের

মধ্যে নিতান্ত অবান্তর এই তসীল কাছারী। তারই ফটকে কয়েক শত মানুষ আজ হানা দিয়েছে, যেন এক দুঃস্বপ্নের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে, হিসেব নিকেশ করতে।

সমস্ত কাছারী বাড়িটার পাগড়ী আর উর্দি গরম হয়ে উঠেছে। লাঠিধারী পুলিশেরা সার বেঁধে পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যেন পাঁচিল টপকে কেউ ভেতরে না ঢুকতে পারে। ফটকের পথ রুখে প্রথম দফায় দাঁড়িয়ে ছিল একদল গুর্খা সৈনিক, সঙ্গে একজন গোরা মেজর। টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র চটপট মোটর লরী দাবড়িয়ে চলে এসেছে। সদর থেকে এক রায় বাহাদুর এস-ডি-ও পত্রপাঠ চলে এসেছেন। ভুঁড়ির ওপর বেল্ট, বেল্টের সঙ্গে রিভলভার। ভুঁড়িতে যতই স্নেহপদার্থ থাকুক রিভলভারটি একেবারে স্নেহবর্জিত। থানা-ইনচার্জ দারোগাবাবু হাতে বন্দুক তুলে নিয়েছেন।

মাত্র তিন শত গ্রাম্য মানুষের একটা জনতা। কারও হাতে একটা লাঠিও নেই। মনের ভুলে লাঠি ছেড়ে দিয়েছে তা নয়, ইচ্ছে করেই ওরা আজ লাঠি ছোঁবে না। কারও মাথার খুলি ভাঙতে ওরা আসেনি। ওদের দাবীটা বড়ই অদ্ভুত। শুনতে খুবই সামান্য, বলতে খুবই সোজা, বলছেও খুব স্পষ্ট করেই। কিন্তু ভাবতে বড় ভয়ানক! এক চরম বিপর্যয়ের মন্ত্র যেন ওদের দাবীতে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তসীল কাছারীর সমস্ত নথিপত্র, কয়েক শত বছরের যত অপমানের ইতিহাসকে আজ শুধু ওরা হাতের মুঠোয় পেতে চাইছে। এই নথিপত্র নিয়ে ওরা চলে যাবে, কোন্ এক অলক্ষ্য বৈতরণীর জলে চিরকালের মত ভাসিয়ে দেবে কে জানে?

সবচেয়ে আশ্চর্য, অস্ত্রে আয়ুধে ও হিংস্র দন্তে কণ্টকিত এই ফটকের মুখেই এসে ওরা ভীড় করেছে। থরে থরে সাজানো এই মৃত্যুর ভ্রুকুটী ভেদ করে, এই পথেই ওরা কাছারী এলাকায় ঢুকতে চায়। পাঁচিল টপকে

ভেতরে যাবার কোন স্পৃহা নেই কারও মনে। সস্তা পথে কোন লোভ নেই, চালাকির কেউ ধার ধারে না। ওরা ফাঁকির তক্ষক নয়। পিস্তল বন্দুকের ঔদ্ধত্যকে অবাধে তুচ্ছ করে, এই দুঃস্বপ্নকে বিদ্রুপে ব্যর্থ করে দিয়ে ওরা চলে যাবে। তাই ওরা এগিয়ে যাবে। এগিয়ে চললো।

থানার জমাদার গর গর্ করে গলার রগ কাঁপিয়ে হুঁসিয়ারী চীৎকার ছড়লা—হঠ্ না হ্যায় তো হঠ্ যাও, নেহি তো মর যাওগে।

ঝটপট সঙ্গীণ চড়িয়ে গুর্খা রাইফেলস্ শক্ত হয়ে দাঁড়ালো।

—হঠ্, যাও হিন্দস্থানসে! মত্ত ঝড়ের গর্জনের মত প্রত্যুত্তর দিয়ে জনতা ফটকের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল।

—হঠ্ না হ্যায় তো হঠ্ যাও, নেহি তো মর যাওগে। আবার সেই গলার শিরা কাঁপানো মৃত্যুর হুংকার।

টোটাভরা রাইফেলগুলি নিশানা ক'রে যেন ফণা তুলে স্থির হয়ে রইল।

—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে! নবীন মেঘের ভেরীর মত জনতার সংকল্প আবার বেজে উঠে প্রত্যুত্তর দেয়।

এস-ডি-ও অর্ডার হাঁকলেন—ফায়ার!

এক রাউণ্ড ছররা গুলী বারুদের গন্ধ উড়িয়ে সশব্দে ছিটকে পড়লো। জনতা যেন আচম্কা ছন্নছাড়া হয়ে সড়কের উল্টো দিকে বহু দূর পর্যন্ত পিছিয়ে গেল। কেউ পথের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপলো, কেউ হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল, কেউ আতঙ্কে দৌড় দিল।

বারুদের প্রথম দফা ধোঁয়া আর গন্ধ মিটে যেতো না যেতেই এই পেছু-হঠে-যাওয়ার দৃশ্যের মধ্যে মাত্র একটি বেপরোয়া আত্মা ফটকের উপর হানা দেবার জন্য একলা ছুটে এগিয়ে গেল।

—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। করেঙ্গে ইয়া—

অনন্তরামের মন্ত্রের অনুচ্চারিত সংকল্প পূর্ণ হলো। মেজরের রিভলভারের গুলি এক নিমেষে ছুটে এসে অনন্তরামের বুকের পাঁজর ফুটো করে দিয়েছে।

কয়েকটি মুহূর্তের মত, এক স্পন্দনহীন মূক পৃথিবীর স্তব্ধতার মধ্যে মাটিতে লুটিয়ে ছট্‌ফট্‌ করে নিজে রঙীন হয়ে উঠলো অনন্ত, মাটি রঙীন হলো।

এর পরের ঘটনার হিসেব অনন্তরাম জেনে গেল না। সবার আগে কারও কাছে বিদায় না নিয়েই সে চলে গেছে। কিন্তু ঐ জনতাই অনন্তরামকে বিদেয় দেবার জন্য কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরে এসে তপসীল কাছারীর ফটকে দাঁড়িয়াছে। লাঠি তরবারি বল্লম বন্দুক ইঁট পাটকেল চালিয়েছে। প্রাণ দিয়েছে, প্রাণ নিয়েছে। তসীল কাছারীর ফটকে শোণিতের উৎসব কিছুক্ষণের জন্য ভয়াল হয়ে উঠেছে। সমস্ত কাছারী এলাকা আগুনে পুড়ে গেছে। শুধু দালানের কালো কালো দেয়ালগুলি বিধ্বস্ত প্রেতালয়ের চিহ্নের মত দাঁড়িয়ে থাকে। অঢেল ফুলের স্তবকে শবাধার সাজিয়ে অনন্তরামকে তারা তুলে নিয়ে চলে যায়।

তসীল কাছারীর ফটকে ঐ যে এক খণ্ড ভূমি, অনন্তরাম যার মাটিকে রঙীন করে দিয়ে গেল—সেই মাটিই এক এক খাব্‌লা লোকে তুলে নিয়ে গেছে। শক্ত পাথুরে মাটি, লোকে জল ঢেলে নরম করে নিয়ে এক এক মুঠো কাদা নিয়ে যায়, এক মুটো পুণ্যের পরমাণু।

শোণিত আর আগুনের খেলা থেমেছে। কিন্তু সকাল সন্ধ্যে লোক আসছে তসীল কাছারীর ফটকে, এ গাঁ থেকে, ও গাঁ থেকে—ভিন্ন জেলার বাজার ও বস্তি থেকে—মাটী নিতে। শুধু এক মুঠো মাটী।

পোড়ো কাছারীর ফটকে দিনকয়েক পরে আবার দেখা দিল পুলিশ

আর ফৌজের লোক। আর পাহারা দেবার মত কিছু নেই। কিন্তু বাধা দেবার মত আর একটা কাজ তারা পেয়ে গেছে। ঐ এক খণ্ড ভয়ানক জমির মাটীকে তারা ঘিরে ধরলো—কেউ মাটী নিতে পরবে না।

সত্যি কেউ মাটী নিতে পারে না। লোকে একটু দূরে দাঁড়িয়েই আগ্রহে তাকিয়ে থাকে। তারপর হতাশ হয়ে চলে যায়।

একদিন, দু'দিন, তিনদিন—সপ্তাহ কেটে যায়। তারও পরে, শালবনের মাথার ওপর দিয়ে প্রতি রাত্রিতে কৃষ্ণা তিথির ক্ষীণ চাঁদের রূপ ধীরে ধীরে ভরে উঠতে থাকে। হঠাৎ একদিন ভোরের আলোকে দেখা যায়, ঐ এক খণ্ড মাটির গায়ে সবুজ ঘাসের আবির্ভাব সাড়া দিয়ে উঠেছে। পুলিশ আর ফৌজের মানুষগুলিকে হঠাৎ দেখতে নতুন রকমের লাগে। যেন তীর্থ ভুমির পবিত্রতাকে ওরা পাহারা দিয়ে সযত্নে আগ্‌লে রেখেছে। ওরা এখনো জানে না যে, ভবিষ্যতের কোন পথিক হয়তো দেবালয় দেখবার জন্য ঠিক এইখানে, এই ভয়ানক মাটির কাছে এসে, এমনি এক সকালবেলায়...।

এমনি এক সকালবেলায় মাত্র কয়েকটি দিন পরে তীর্থযাত্রীর মতই কয়েকটী মানুষ হেঁটে হেঁটে তসীল কাছারীর ফটকের প্রায় কাছাকাছি কাশফুলে ছাওয়া মাঠের ওপর এসে দাঁড়ালো। প্রমীলা, প্রমীলার বাবা নন্দলাল, প্রমীলার ছোট ভাই বাসুদেব আর কৈলাস।

কি দেখতে ওরা এসেছে তা নিজেরাই ভাল করে জানে না। তবু ওরা তাকিয়েছিল ফটকের দিকে। বুড়ো নন্দলালের একজোড়া হতভম্ব চোখ জলে ভিজে গিয়েছে। লক্ষ বছরের ধৈর্যে কঠিন, পিতা হিমাদ্রির বুকের বরফে আবার নতুন করে পুত্রশোকের জ্বালা লেগেছে।

ছোট ছেলে বাসুদেব কান্না লুকোবার জন্যেই যেন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হিন্দুস্থানের দেবদারু বনের একটি শিশু-ঝড় হঠাৎ

বড় আকাশের মেঘের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখে জলের ঝাপ্‌টা লেগেছে, ভাল করে বুঝতে পারছে না বলেই যেন অভিমান হয়েছে।

সবার পেছনে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল কৈলাস।

শুধু কাঁদতে পারলো না বিধবা প্রমীলা। প্রমীলা যেন এক তপস্বিনী সিদ্ধার্থিকার সত্তা লাভ করেছে। জীবনের এত বড় ক্ষতিটার হিসেব খতিয়ে দেখবার কোন গরজ নেই। কোন দুঃখকেই আজ যেন আমল দিচ্ছে না প্রমীলা। কেমন দেবী-দেবী ভাব। যেন একটা চন্দন-চর্চিত কঠিন আত্মাভিমানের মূর্তি। যাবার আগে একটা মুখের কথা পর্যন্ত না ব'লে যে চলে গেল, তার দেওয়া শাস্তি সে নিশ্চয় গ্রহণ করবে। কিন্তু কেঁদে কেটে নয়, হেসে হেসেও নয়—একেবারে শূন্য হয়ে গিয়ে। এই কয়টা দিন, সকাল সন্ধ্যা ও রাত্রি, শুধু গভীর বিশ্বাসে শিবনাম জপেছে আর শিবস্তোত্র পড়েছে প্রমীলা। শুন্যতার ভগবান তাকে কৃপা করে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

ঘরে ফেরবার আগে প্রমীলা একবার কৈলাসের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো—আর কাঁদবেন না কৈলাস ভাই।

এই সান্ত্বনাকে সইতে না পেরেই কৈলাস যেন অভিমানী ছেলেমানুষের মত আরও বেশী আবোল-তাবোল বকতে আরম্ভ করলো—আমি শিবভক্ত প্রমীলা বহিন্। তুমি বিশ্বাস কর, আমি সত্যিই ভক্ত, শুধু ভক্ত।

তপস্বিনীর হৃদয়ভরা শূন্যতার গায়ে নেহাৎ অসাবধানেই যেন এক টুক্‌রো মেঘের সজলতা লাগে। প্রমীলার গলার স্বর আর একবার যেন ভুল ক'রে মমতার ছোঁয়ায় স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে—হ্যাঁ কৈলাস ভাই।

কৈলাস—তাই তো আমি শিবালয় দেখতে এখানে এসেছি।

শিবালয়! প্রমীলার শুক্‌নো চোখের দৃষ্টি তসীল কাছারীর ফটকের একখণ্ড ঈষৎ শ্যামল মাটির বেদীর ওপর গিয়ে লুটিয়ে পড়লো। দু'টো পুলিশ তখনো জায়গাটা পাহারা দিচ্ছে। লম্বা লম্বা লাঠির ছায়া পড়েছে মাটির ওপর।

প্রমীলাদের সাম্‌নে অনেকগুলি কৌতূহলী পথচারী লোক একটা বিস্ময়ের ভীড় সৃষ্টি ক'রে দাঁড়িয়েছিল। তারা শুধু বুঝতে চেষ্টা করছিল—কে এরা?

হঠাৎ বুকফাটা শোকের বিলাপ বাতাসে ছড়িয়ে, সুর ক'রে টেনে টেনে, মাথা কুটে, ক্ষমা চেয়ে, কেঁদে উঠলো প্রমীলা। গৌরী নয়, সীতাও নয়। কৌতুহলী জনতা শুধু বুঝতে পারলো, নতুন সারাইয়ের অনন্ত মুদীর বউ কাঁদছে।

চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ

আমাদের ক্লাসটা ছিল একটি এথ্‌নোলজির ল্যাবরেটরীর মত। এমন বিচিত্র মানবতার নমুনা আর কোন স্কুলের কোন ক্লাসে আছে জানি না। তিনটী রাজার ছেলে ছিল আমাদের ক্লাসে। একজন জংলী রাজার ছেলে, কুচকুচে কালো চেহারা। আর দু'জন ছিল সত্যিকারের ক্ষত্রিয়াত্মজ—সুগৌর গায়ের রঙ, পাগড়ীতে সাঁচ্চা মোতির ঝালর ঝুলতো। তা ছাড়া ছিল—সিরিল টিগ্‌গা, ইম্যানুয়েল খাল্‌খো, জন বেস্‌রা, রিচার্ড টুডু আর ষ্টীফান হোরো এবং আরো অনেক। এত ওরাওঁ আর মুণ্ডা সন্তানের সমাবেশের মাঝখানে তবু আমরা ক'জন ইণ্টার ক্লাস পরিবারের বাঙালী ও বেহারী ছেলে শুধু বুদ্ধির জোরে সর্বকর্মের মোড়লীর গৌরব অধিকার করে বসেছিলাম। রাজার ছেলেগুলোকে আমরা বলতাম সোনা ব্যাঙ, আর মুণ্ডা ও ওরাওঁদের বলতাম কোলা ব্যাঙ। ওদের কাউকে আমরা কোন দিন গ্রাহ্যের মধ্যে আনতাম না। রাজার ছেলেগুলি অবশ্য আমাদের সঙ্গে কথা বলতো না। অপর পক্ষে টিগ্‌গা, খাল্‌খো, বেস্‌রা, টুডু—ওরা আমাদের সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারলে ধন্য হয়ে যেত। টিফিনের সময় একটা আনি নিয়ে টুডুকে দিতাম। বল্‌তাম—টুডু চট্‌ করে এক দৌড়ে এই এক আনার ঝালবাদাম নিয়ে এস তো। গঙ্গা সাহুর দোকান থেকে আন্‌বে।

স্কুল থেকে গঙ্গা সাহুর দোকান দেড় মাইল হবে। কৃতার্থ ভাবে আনিটা হাতে তুলে নিয়ে টুডু সেই প্রচণ্ড রোদে ঝলসানো মাঠের ওপর দিয়ে পোড়া হরিণের মত উদ্দাম বেগে দৌড়ে চলে যেত গঙ্গা

সাহুর দোকানে। ফিরে এসে ঝাল বাদামের ঠোঙাটা আমাদের হাতে সঁপে দিয়ে নিজে দূরে সরে যেত। আমরা বল্‌তাম—কী আশ্চর্য টুডু, এতটা পথ দৌড়ে এলে তবু তুমি একটুও হাঁপাচ্ছো না!

আর্যসুলভ এই ফাঁকা কথার কারসাজীটাকে আন্তরিক অভিনন্দন মনে করেই টুডু দূরে দাঁড়িয়ে গর্বভরে হাসতো! আমরা চোখ টিপে লক্ষ্য করতাম—টুডু কেমন জোর করে তার পরিশ্রান্ত শ্বাসবায়ুটাকে ঢোঁক গিলে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। তাকে ঝালবাদামের একটু শেয়ার দিতে আমরা বোধ হয় ইচ্ছে করেই ভুলে যেতাম। দিতে গেলও টুডু নিত না।

আমরা দেখতাম, একটু দূরে দাঁড়িয়ে সুতীব্র একটা দৃষ্টি দিয়ে ষ্টীফান হোরো আমাদের হাবভাব লক্ষ্য করছে। আমরা ঘাবড়ে যেতাম। ষ্টীফান যেন তীর মেরে আমাদের বুকের ভেতরের ধূর্ত রসিকতার ফুসফুসটাকে চেখে দেখছে। সব বুঝে ফেলতে পারছে। কিন্তু সবার মধ্যে একমাত্র ষ্টীফানই পারে, আর কেউ নয়?

টুডু, খাল্‌খো, টিগ্‌গা, বেস্‌রা সকলেই কতকটা এই রকমেরই বাধ্য বেকুব বিশ্বাসী আর নিরীহ ছিল। আমরা মনে মনে হাসতাম।—হায়রে, রাঁচীর জঙ্গলের যত কোল, যত সব কোলা ব্যাঙ!

ওদের মধ্যে ঐ একটী মাত্র কাল কেউটে ছিল ষ্টীফান হোরো। বড় উদ্ধত ছিল ষ্টীফানের স্বাভাবটা। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, হোরোর কাছে আমাদের আভিজাত্য চুপে চুপে হার মেনে নিত। ওর সঙ্গে সদ্ভাব রাখার জন্য মাঝে মাঝে যেচে ওর সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে। আরও লজ্জার বিষয়, হোরো এক এক সময় আমাদের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে অন্যদিকে

মুখ ঘুরিয়ে নিত। ঐ মাথাঠাসা মোটা মোটা চুলের ঘুঙুর, চেপ্টা নাক, আবলুস কালো চেহারা—তবু এত অহঙ্কারী!

ষ্টীফানের ওপর প্রথম একটু ভয় ও শ্রদ্ধা হলো একটা ঘটনায়। সেদিন খেলার মাঠে দেখলাম—হোরো হকি ষ্টিক আনেনি। হোরো তবু খেলতে চায়। কিন্তু নিজের হকি নিয়ে খেলতে হবে—এটাই আমাদের নিয়ম ছিল। হোরো বার বার আমাদের অনুরোধ করলো—কিছুক্ষণের জন্য কেউ আমাকে একটা ষ্টিক ধার দাও, এক হাত খেলেই আবার দিয়ে দেব।

কেউ কারও ষ্টিক পরের হাতে দিতে রাজী ছিল না। হোরো বল্‌লো—আমি বিনা ষ্টিকেই খেল্‌বো।

গোঁয়ার হোরো একটা ঘণ্টা আমাদের উদ্দাম হকি ষ্টিকে বাড়ি আর আছাড়ের সঙ্গে সমান স্বাচ্ছন্দ্যে পা দিয়ে খেলে গেল। হোরোর দুটো নিরেট শিশু কাঠের পায়ের ওপর বেপরোয়া হকি ষ্টিক চালাবার সময় এক একবার সন্দেহে আমাদেরই হাত কেঁপে উঠেছে—ষ্টিকটাই ভেঙে না যায়।

ষ্টীফান. হোরো ক্রমেই আমাদের ভাবিয়ে তুলছিল। শুধু ভয় আর শ্রদ্ধা নয়—আর একটা কারণে আমরা হোরোকে এইবার ঈর্ষা করতে আরম্ভ করলাম। লেখা পড়ার ব্যাপারে হোরো আমাদের মনের শান্তি নষ্ট করতে চলেছে। ইংরাজী কবিতার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যায় সে আমাদের ইন্দুকেও পরাজিত করে ছাব্বিশ নম্বর বেশী পেল। ঘটনাটা জাতীয় অপমানের মত আমাদের গায়ে বিঁধলো। বেহারী ছাত্রদের জাতীয়তা কতটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল জানি না, কিন্তু হোরোর সম্পর্কে একটা নিন্দার ষড়যন্ত্রে তারাও আমাদের সঙ্গে ইউনাইটেড ফ্রণ্ট করলো। আমরা বেশ জোর গলায় রটিয়ে

দিলাম—এ স্কুলে অখৃষ্টানদের ওপর বড় অবিচার চলেছে। মাষ্টারেরা সবাই খৃষ্টান। সুতরাং খৃষ্টান হোরো বেশী নম্বর পাবে তাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু কী ভয়ানক অন্যায়!

আমাদের অভিযোগকে মনে প্রাণে সত্য বলে বুঝলেন শুধু একমাত্র অখৃষ্টান শিক্ষক—সংস্কৃতের মাষ্টার বৈজনাথ শর্মা—পণ্ডিতজী।

পণ্ডিতজী আমাদের সান্ত্বনা দিলেন।—কি আর করবে বাবা! পাদরীদের স্কুলে এই রকমই অন্যায় কাণ্ড হয়ে থাকে। যাক্ ইউনিভার্সিটি তো আছে। সেইখানে ধরা পড়ে যাবে—কার কতখানি যোগ্যতা।

প্রমোশনের পর নতুন বছরে ষ্টীফান হোরো আরও ভয়ানক এক গোঁয়ার্তুমি করে বসলো—পা দিয়ে হকি খেলার চেয়েও ভয়ানক। ষ্টীফান হোরো তার অ্যাডিশনাল ইংরিজী ছেড়ে দিয়ে সংস্কৃত নিল। খৃষ্টান টীচারেরা সবাই হোরোকে ধমকালেন, হেড মাষ্টার ফাদার লিগুন ক্ষুণ্ণ হলেন, পণ্ডিতজী অদ্ভুতভাবে হাসতে লাগলেন। তবু আনর্য হোরোর সংস্কৃত পড়ার প্রতিজ্ঞা তিলমাত্র বিচলিত হলো না।

পণ্ডিতজী আমাদের আড়ালে ডেকে নিয়ে একটা অস্বস্তির হাসি হেসে বললেন।—ষ্টীফান হোরো সংস্কৃত নিয়েছে। আর কি? এইবার দেবভাষায় কপালে কি আছে কে জানে!

পণ্ডিতজী হাসতে লাগলেন। আমাদের কেমন সন্দেহ হলো—পণ্ডিতজীকে যেন খুসী খুসী দেখাচ্ছে! যাক্।

শীঘ্রই আমাদের যত ধারণা সংশয় আক্রোশ ও আশঙ্কা পর পর কতগুলি ঘটনায় আরও জটিল হয়ে উঠতে লাগলো।

নিউ টেষ্টামেণ্ট থেকে ডেভিডের গাথাগুলি আগাগোড়া নির্ভুল আবৃত্তি করে ফার্ষ্ট প্রাইজ পেল ষ্টীফান হোরো। সেকেণ্ড, থার্ড, ও ফোর্থ প্রাইজের অগৌরবে মুখ শুক্‌নো করে আমরা বসে রইলাম।

ফাদার লিগুন উচ্ছুসিত আনন্দে হোরোর প্রশংসা করে ঘোষণা করলেন।—ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর তোমায় নিশ্চয় দারোগা করে দেবো হোরো, আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম।

তা করতে পারেন ফাদার লিগুন। এতটুকু সুপারিশ করার ক্ষমতা তাঁর আছে, কিন্তু ঐটুকুই যদি ষ্টীফান হোরোর জীবনের পরমার্থ হয়ে, হোক্, তার জন্য আমরা মোটেই হিংসা করি না। তার জন্য এত কষ্ট করে নিউ টেষ্টামেণ্ট মুখস্থ করার দরকার নেই আমাদের।

তাব পরের দিনই বাইবেল ক্লাসে হোরোকে একেবারে ভিন্ন রূপে দেখতে পেলাম আমরা। দুর্বোধ্য বিস্ময়ে আমরা শুধু খাবি খেতে লাগলাম।

বাইবেল ক্লাসের একেবারে পেছনের বেঞ্চিতে বসেছিল হোরো। পড়াতে পড়াতে ফাদার লিগুন বার বার পুলকিত নেত্রে হোরোকে প্রশ্ন করছিলেন—ষ্টীফান, তুমিই উত্তর দাও। তুমিই সব চেয়ে ভাল উত্তর দিতে পাববে।

—জানি না স্যর। ষ্টীফানের রুক্ষ গলার স্বরে চমকে উঠে আমরা সবাই তার দিকে তাকালাম। দেখলাম, ষ্টীফান হোরোর আরও রুক্ষ ও বিরক্ত মুখটা ডেস্কের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। ফাদার লিগুনের দিকে যেন তাকাতে চায় না হোরো।

ফাদার লিগুনের সোনালী দাড়ির ওপর লাল্‌চে মুখে ক্ষণে ক্ষণে গাঢ় রক্তচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ছিল। চোখের দৃষ্টিটা তীব্র হয়ে উঠছিল। ষ্টীফানের দিকে তাকিয়ে রুষ্ট স্বরে বললেন।—ষ্টীফান, আজ কি তোমার ব্রেনটাকে দরজার বাইরে রেখে ক্লাসে এসেছ তুমি? উত্তর দিতে পারছো না কেন?

—জানি না স্যর। আবার ষ্টীফান হোরোর সেই স্পষ্ট অবিচল ও অকুতোভয় উত্তর শুনে আমাদের বুকে দুরু দুরু সুরু হয়ে গেল।

আকস্মিকভাবে অসময়ে ক্লাস বন্ধ করে ফাদার লিণ্ডন চলে গেলেন।

কিন্তু ষ্টীফান হোরোর এত রাগ কেন? এত অভিমান কেন? নিউ টেস্টামেণ্ট মুখস্থ করে কার মাথা কিনেছে? কী হতে চায়? হাউস অব্ লর্ডস্-এর সদস্য?

এর পর বিপদে পড়লেন পণ্ডিতজী। পণ্ডিতজীর মতি-গতিও ক'দিন থেকে কেমন একটু বিসদৃশ দেখাচ্ছে। আমাদের এড়িয়ে যেতে পারলেই যেন পণ্ডিতজী একটু সুস্থ বোধ করেন। দেখা হলেই ব্যস্ত হয়ে সরে পড়েন। অথচ পণ্ডিতজীকে কত কথাই না জিজ্ঞাসা করার আছে। ফার্ষ্ট টার্মিনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। এই তো যত নম্বর প্রমোশন আর পজিশন নিয়ে একটা দুশ্চিন্ত গবেষণা ও কৌতূহলের সময়। পণ্ডিতজীর উদার হাতের নম্বর অনেক সময় আমাদের টোটাল'কে পরিস্ফীত করে কৃপণ খৃষ্টান শিক্ষকদের ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে। আজও আমরা তাই জানতে চাই—পণ্ডিতজী কার জন্য কতদূর করলেন। ইন্দুকে যদি একবার বুক ঠুকে পঁচাশি দিয়ে দেন তবে টোটালে তার ফার্ষ্ট হওয়া সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকে না। সব খৃষ্টানী ষড়যন্ত্র জব্দ হয়ে যায়।

পণ্ডিতজীর বাড়ীতে গিয়েছি, লাইব্রেরী ঘরে একা একা পেয়েছি, পথে পথরোধ করেছি—কিন্তু পণ্ডিতজী কিরকম গোলমেলে কথা বলে সব কৌতূহল যেন চাপা দিয়ে দিতে চান। আমাদের সন্দেহ আরও প্রথম হয়ে ওঠে।

আম্‌তা আম্‌তা করে দু'বার মাথা চুলকিয়ে পণ্ডিতজী সত্য সংবাদটা ব্যক্ত করে দিলেন।—সংস্কৃতে ষ্টীফান হোরো সব-চেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে—একশোর মধ্যে পঁচাত্তর।

—আর ইন্দু? আমাদের প্রশ্নে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পণ্ডিতজী অপরাধীর মত বললেন—বত্রিশ।

মাত্র বত্রিশ! পণ্ডিতজীর মত বিশ্বাসহন্তা পৃথিবীতে আর নেই। আমাদের ক্ষোভ অসংযত হয়ে উঠেছিল। পণ্ডিতজী মিনতি করে বললেন—ষ্টীফান হোরো এত ভাল সংস্কৃত লিখেছে, এ-তো তোমাদেরই গৌরব, আর্যভাষার গৌরব। এতে তো তোমাদের খুসী হবার কথা। এটা হোরোর জয় নয়, এটা হলো সংস্কৃত ভাষার জয়।

চুলোয় যাক সংস্কৃত ভাষার জয়। ইন্দু ফার্স্ট হতে পারবে না, এটা যে আর্যত্বের কত বড় পরাভব, বাঙালীর কত বড় অপমান—তা পণ্ডিতজী বুঝলেন না। কিন্তু আমরা ঠিক রহস্যটী বুঝে ফেললাম—পণ্ডিতজী হলেন বেহারী, তাই।

কিন্তু বাতাসের নিশ্চয় সেই পরম গুণ আছে—যার জন্য শত অন্যায়ের অবরোধের মধ্যেও ধর্মের কল নড়ে ওঠে। লাইব্রেরী ঘরে যেদিন বোর্ড-নিবদ্ধ মার্ক-শীটের কাছে আমরা গিয়ে চোখ তুলে দাঁড়ালাম, সেদিন আমরা বিশ্বাস করলাম—সত্যের জয় আছে, মিথ্যার পরাজয় আছে।

ইন্দুই ফার্ষ্ট হয়েছে। ষ্টিফান হোরো অনেক নীচে। ইংলিশে, ইতিহাসে, ভুগোলে, অঙ্কে—সব বিষয় অতি নগণ্য নম্বর পেয়েছে ষ্টীফান হোরো, একমাত্র সংস্কৃত ছাড়া। ভেবে অবাক্ হলাম আমরা—খৃষ্টান টিচারেরাও হোরোর ওপর হঠাৎ এত নির্দয় হয়ে উঠলেন কেন?

আরও কিছুদিন পরে ষ্টীফান হোরো আমাদের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য হয়ে গেল। শুধু আমাদের কাছে নয়, থাল্‌খো, বেস্‌রা, টিগ্‌গা সবাই বলাবলি করে—কি জানি হয়েছে হোরোর!

বড়দিনের উৎসবে আমরাও পিকনিক করতে গিয়েছিলাম

শিলোয়ারার জঙ্গলে। রান্নার কাঠের জন্য মহা উৎসাহে একটা মরা কেঁদ গাছ ভাঙছিলাম আমরা। হঠাৎ দেখলাম, স্রোতের ধার দিয়ে একা একা হোরো চলেছে। হাতে একটা গুলতি। আমরা চেঁচিয়ে ডাকলাম হোরোকে। এ রকম অভাবিত ভাবে হোরো যখন এসেই পড়েছে, তখন সেও আমাদের সঙ্গে এই বনভোজনের আনন্দের একটু শেয়ার নিক্ না কেন। পোলাও হবে, মাংস হবে, দই আছে, বৈকুণ্ঠ ময়রার সন্দেশ আছে। খেয়ে খুসী হবে হোরো। একেবারে আন্‌কোরা মুণ্ডা, জীবনে বোধ হয় এসব খায়নি কখনো।

হোরো এগিয়ে এল। আমাদের কাছে এসেই একটা শাল গাছে শাখার দিকে নিবিষ্টভাবে তাকিয়ে রইল। তারপরেই শিকার লক্ষ্য করে গুলতি তুলে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা হৃষ্টপুষ্ট কাঠবিড়ালি আহত হয়ে ধপ্ করে মাটীর ওপর পড়লো। একটা লাফ দিয়ে আহত কাঠবিড়ালী-টাকে লুফে নিয়ে পকেটের ভেতর রাখলো ষ্টীফান।

আমরা আতঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করলাম—ওটা কি হবে ষ্টীফান ?

—খাব। নিঃসঙ্কোচে কথাটা বলে ফেললো হোরো। মনের ঘেন্না চেপে রেখে তবু আমরা হোরোকে নিমন্ত্রণ করলাম।—ওসব ছুঁড়ে ফেলে দাও ষ্টীফান। পাগল কোথাকার। এস, আমাদের পিক্‌নিকে তুমিও খাবে আমাদের সঙ্গে।

—না। হোরোর কাল মুখের ভেতর থেকে ঝক্‌ঝকে দুপাটি সাদা দাঁতের হাসি আপত্তি জানালো।

এ রকম জংলী হয়ে যাচ্ছে কেন ষ্টীফান ? রিচার্ড টুডু একদিন কানে কানে আমাদের বললো,—সত্যিই কি জানি হয়েছে হোরোর। বোধ হয় শীগ্‌গির পাগল হয়ে যাবে। ফাদার লিণ্ডন আমাদের সাবধান করে দিয়েছে, হোরোর সঙ্গে যেন কেউ না মেশে।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম। —কেন টুডু ?

টুডু।—একজন বুড়ো সোথায় সঙ্গে আজকাল বড় ভাব হয়েছে। লুকিয়ে লুকিয়ে প্রতিদিন মঙ্গলবারের হাটে গিয়ে সোথার সঙ্গে দেখা করে হোরো।

—তাতে কি এমন অপরাধ করেছে হোরো ?

টুডু ভুরু কুঁচকে বললো।—অপরাধ নয় ? এ'তে বাইবেলের অপমান করেছে হোরো। চার্চে যায় না, কারও কথা শোনে না। তিন দিন বোডিংয়ে ছিল না। ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

—বোর্ডিংয়ে ছিল না ? কোথায় ছিল।

টুডু গলার স্বর আরও নামিয়ে চুপে চুপে বললো।—বুরুতে গিয়েছিল। সেখানে নেচে গেয়ে এসেছে। পেট ভরে ইলি খেয়ে নেশা করেছে। তাছাড়া……

টুডু হঠাৎ থেমে গিয়ে বললো—একটা কথা বলছি, কাউকে বলো না যেন। জানতে পারলে হোরো আমায় মেরে ফেলবে।

টুডুকে অভয় দিলাম।—না, কেউ জানতে পাবে না, তুমি বল।

টুডু।—একটি মেয়ের সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়েছে। মেয়েটার নাম চির্‌কি—মোরাঙ্গি পাহাড়ের মুর্‌মুদের মেয়ে।

টুডুর কথাগুলি মুগ্ধ হয়ে যেন গিল্‌ছিলাম আমরা। আমাদেরই সহপাঠী—দীন দরিদ্র মুণ্ডা হোরো, কতই বা বয়স ; তবু সেই হোরো আজ এক মুহূর্তে আমাদের বাইবেল ক্লাস, সংস্কৃতের নম্বর আর হকি খেলার সব আনন্দ উত্তেজনাকে মূল্যহীন করে দিয়ে, এক রোমাঞ্চময় অনুরাগের স্কুল গিয়ে সবার অগোচরে নাম লিখিয়ে এসেছে। সেই মেয়েটি, চির্‌কি মুর্‌মু তার নাম, তাকে যেন আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি। শাল ফুলের মালা গলায় দিয়ে, খোঁপায় একটা বনজবা গুঁজে, স্রোতের ভাষায় মত খল্‌ খল্‌

হাসির বন্ধনে হোরোর কালো হৃদয়ের সব দুরন্তপনাকে বন্দী করে কোন্ উপত্যকার একটা নিভৃতে নিয়ে চলে গেছে। সেখান থেকে ফিরে আসার সাধ্য নেই হোরোর। কোন্ সাধেই বা আস্‌বে।

টুডু তখনো সেই রকম পাকা পাকা কথা বলে চলেছিল।—মুরমুরা বোঙা পূজো করে, ওদের সঙ্গে মেলামেশা কি উচিত হলো? বড় ভুল করেছে হোরো।

ষ্টীফান হোরোকে বোর্ডিং থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে—এটা শুধু একটা গুজব হয়েই রইল। কার্য্যতঃ দেখলাম, হোরোকে তাড়োনো হলো না। নিজের ইচ্ছে মত ক্লাসে আসে হোরো। নিজের ইচ্ছে মতই অনুপস্থিত হয়। অনুগত খৃষ্টান ছাত্রেরা হোরোকে এড়িয়ে যায়। হোরো যেন একঘরের মধ্যেই একঘরে হয়ে আছে।

রিচার্ড টুডু যে-আশঙ্কা প্রচার করেছিল—কাজের বেলায় দেখলাম তার উল্টোটাই হয়েছে। হোরোকে বোর্ডিং থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি। সে বোর্ডিংয়েই আছে—অথচ তার সম্পর্কে যেন সব শাসন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

আমার দেখে অবাক্ হয়ে যেতাম, এক একদিন বিকেলে ফাদার লিণ্ডন টেনিস খেলেছেন হোরোর সঙ্গে। আশ্চর্য! টুডু বেস্‌ টিগ্‌গা—এরা হোরোর চেয়ে কম কালো আর বেশী বিশ্বাসী খৃষ্টান। কিন্তু আজ পর্যন্ত ওরা শুধু ফাদার লিণ্ডনের টেনিস খেলার সময় বল কুড়িয়ে দেবার মর্য্যাদা পেয়েছে। তার বেশী নয়। আর ষ্টিফান একেবারে...সত্যি আশ্চর্য।

বেডিংয়ের বাগানে বিকাল বেলা জল দেবার ভার ছিল হোরোর ওপর। এই কর্তব্যটুকুর বিনিময়ে হোরো বোডিংয়ে ফ্রী খেতে পেত আর থাকতো। আমরা দেখলাম—হোরো আর বাগানে যায় না, জল তোলে না। উদ্যানসেবার ভার টিগ্‌গার ওপর চাপানো হয়েছে।

বেচারী টিগ্‌গা! সকাল বেলার রান্নার জন্য কাঠ কাটে, তার ওপর আবার বিকেল বেলা জল তোলা!

টুডু এসেই আর একদিন একটা খবর দিল—আজকাল আর হাটে যাবার সুযোগ পায় না। ষ্টীফান প্রতি মঙ্গলবারে সারা দুপুর ফাদার লিণ্ডনের ঘরে বসে Pilgrim's Progress পড়ে। পড়া শেষ হলে নাকি চা-বিস্কুট খায় হোরো। ফাদার লিণ্ডন খাওয়ান।

আমাদের উৎসাহ ঔৎসুক্য আলোচনা আর গবেষণার সীমা ছিল না। অলক্ষ্যে কত বড় একটা ঘটনার দ্বন্দ্ব জমে উঠেছে, তার কিছু কিছু আভাষ আমরা আমাদের অনুভব দিয়ে ধরতে পারছিলাম। এক দিকে কেম্ব্রিজের এম-এ বিখ্যাত শিক্ষিত সুসভ্য ও শ্রদ্ধেয় ফাদার লিণ্ডন।... অপর দিকে কোন্ এক জংলী মুণ্ডা ডিহির বুড়ো সোখা—দীনতম নগণ্য অর্ধোলঙ্গ বর্বরবেশী এক যাদুমন্ত্রা। যেন দুই যুগে লড়াই—বিংশ শতক বনাম প্রাক্ ইতিহাস। বুড়ো সোখা বোধ হয় সে-লাঞ্ছনা ভুলতে পারে না—ছেলেধরা পাদরীরা তাদের ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, খৃষ্টান করে দিয়েছে হোরোকে। তারই প্রতিশোধ নেবে বুড়ো সোখা। এই সুসভ্য ডাইনদের দুর্গ থেকে আবার জঙ্গলের ছেলেকে জঙ্গলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

ফাদার লিণ্ডন তাই বোধহয় সতর্ক হয়েছেন। ষ্টীফান হোরো যদি আবার জংলী হয়ে যায়, সে-পরাজয় আর অপমান বড় বেশী করে বুকে বাজবে। সহ্য করা কঠিন হবে। লিণ্ডন জানেন প্রতি মঙ্গলবারের হাটে বুড়ো সোখা আসে। একটা আরণ্য আত্মা প্রতিশোধ নেবার জন্য যেন আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সুযোগ খুঁজছে। চা বিস্কুট টেনিস—সুসভ্যতার এক একটা প্রসাদ খাইয়ে হোরোকে যেন পোষ মানিয়ে রাখতে চাইছিলেন ফাদার লিণ্ডন।

আমরা বলতাম—চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ। দেখা যাক্, কে জেতে কে হারে।

গুড ফ্রাইডের ছুটীতে সবাই দেশে যাবার ছুটি পেল। টুডু টিগ্‌গা বেস্‌রা খাল্‌খো— সবাই চলে গেল। ওদের পক্ষে যাবার কোন বাধা ছিল না। কাঁধের লাঠিতে এক একটা পোঁটলা ঝুলিয়ে জঙ্গলের পথে ত্রিশচল্লিশ মাইল একটানা হেঁটে ওরা চলে যাবে নিজের নিজের ডিহিতে। কোন পাথেয় দরকার হয় না। ততখানি পয়সা খরচ করার সামর্থ্যও নেই ওদের।

কিন্তু হোরোকে ছুটি দিতে রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়লেন ফাদার লিগুন। হোরো যেদিন গেল, সর্ভিস বাস্‌টা এসে দাঁড়ালো বোর্ডিংয়ের কাছে। আমরা দেখলাম, ফাদার লিগুন মণিব্যাগ থেকে টাকা বের করছেন—বাসের টিকিট কিনে দিচ্ছেন হোরোকে।

আমাদের মধ্যে বাজি ধরা হলো—হোরো আর ফিরে আসবে কি না। ইন্দু বললো—নিশ্চয় আসবে। ফাদার লিগুন ওর জংলীপনা ঘুচিয়ে দিয়েছে। দুবেলা চা-বিস্কুট মারছে আজকাল। তার আস্বাদ কি ভুলতে পারবে হোরো!

আমি বললাম—আর ফিরে আসবে না হোরো। এখানে না হয় চা-বিস্কুট আছে, কিন্তু ওদিকে যে...

ইন্দু।—ওদিকে কি?

বললাম।—চির্‌কি মুর্‌মুকে ভুলে গেলে?

ইন্দু একটু নিরাশ হয়ে পড়লো।—তাই তো!

ছুটি ফুরিয়ে গেলে আবার বোর্ডিংয়ের জীবন চঞ্চল হয়ে উঠলো। সবাই এসেছে। ষ্টীফান হোরো ফিরে এসেছে। ইন্দুর জিত হলো। আমরা নিরাশ হয়ে পড়লাম। রাগ হ'লো হোরোর ওপর। হোরোটা সত্যিই একটা গবেট ও বেরসিক।

কিন্তু টুডুর কাছে গল্প শুনে আমাদের এই আক্ষেপ মুহূর্তে মুছে গেল। আমরা শুন্‌লাম বুড়ো সোখার কথা, হোরোর কথা, চিরকি মুর্‌মুর কথা। হোরোদের জঙ্গলের ছবিটা মুহূর্তের মধ্যে ফোটা পলাশের আলেয়ার মত হয়ে আমাদের কল্পনার সীমার পারে দুল্‌তে সুরু করে দিল।

ইন্দু বললো।—চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধে বুড়ো সোখার জয় অবধারিত।

হোরোর পাশের ডিহির ছেলে টুডু। খৃষ্টান টুডুরা অখৃষ্টানদের সঙ্গে মেশে না। টুডু তবু যেন গোয়েন্দার মত হোরোর সব কীর্তি দেখে এসেছে। তবে টুডু প্রাণ থাকতে ফাদার লিণ্ডনের কানে এসব কথা কখনো তুলবে না। হোরোর ওপর প্রচণ্ড একটা শ্রদ্ধা ও মমতা আছে টুডুর। হোরোর কাছে গিয়ে কিছু বলতে পারে না বলেই, আমাদের কাছে বলে। ব'লে ব'লে যেন স্তব্ধ শ্রদ্ধার বেদনা খানিকটা হালকা করে নেয়।

টুডু দেখেছে—একদিন তীর দিয়ে একটা হরিণ মেরেছিল হোরো। স্রোতের ধারে হোরো দাঁড়িয়াছিল ধনুক হাতে। চির্‌কি মুরমু তার পা ধুইয়ে দিচ্ছিল।

টুডু দেখেছে—চির্‌কি তাদের গাঁয়ের ওরা থেকে জ্যোৎস্নারাতে চুপে চুপে পালিয়ে এসেছে। হোরো আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চির্‌কিকে হাতে ধরে নিয়ে গেছে।

টুডু দেখেছে—হোরো খৃষ্টান হয়েও অখ্‌রাতে গিয়ে মাদল বাজিয়েছে। চির্‌কিও নাচে কিনা সেখানে। বুড়ো সোখা ভালবাসে হোরোকে। কেউ তাই হোরোকে ঘৃণা করে না।

টুডু বললো।—জংলীদের সঙ্গে মিশে দুদিন সেঙেরা করেছে হোরো। টাঙি হাতে উৎসবে পাগলের মত নেচেছে। শিমূল গাছে আগুন ধরিয়েছে—দাউ দাউ করে আগুন জ্বলেছে। সবার আগে এক লাফ দিয়ে এক কোপে জলন্ত গাছ কেটেছে হোরো।

টুডু গলার স্বর খুব অস্পষ্ট করে ভয়ে ভয়ে বললো।—আমি দেখেছি, তারপর গায়ের ফোস্কাতে ঠাণ্ডা বাতাস লাগাবার জন্য আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছে হোরো। চির্‌কি মুর্‌মু আস্তে আস্তে এসে হোরোকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে।

বোর্ডিংয়ের পাশে ছোট মাঠের ঘাসের উপর সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে আমরা টুডুর গল্প শুনছিলাম। হঠাৎ বোর্ডিংয়ের বারান্দা থেকে একটা বাঁশীর স্বর ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে তারই সঙ্গে মিলিয়ে, তালে তালে মাথা দুলিয়ে, টুডু গুন্ গুন্ করে গাইতে লাগলো।—

নাতা মাতা বির্‌কো তালা
রে নালো হোম নির্ জা
রাগা ইংগা......

উৎফুল্ল টুডুর হাবভাব আর উৎসাহ দেখে মনে হলো—এখুনি সে নাচতে সুরু করে দেবে।

—কে বাজাচ্ছে বাঁশী? কে?

আমাদের ব্যস্ত জিজ্ঞাসার উত্তরে টুডু গান থামিয়ে বললো।—ঐ, সেই গান। হোরো সেই সুরটা বাজাচ্ছে।

—কোন্ গান?

—চির্‌কি মুর্‌মুর গান।

—গানটার মানে কি টুডু?

টুডু উত্তর দিল।—গানটার অর্থ, শোন আমার জোয়ান বন্ধু, পালিয়ে যেও না, এই ঘন জঙ্গলে আমায় একা ফেলে চলে যেও না।

একটা পুলকের সঞ্চার আমাদের মনের অগোচরে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। বললাম।—এ যে আমাদেরই মত গান টুডু!

ইন্দু চাপা সুরে আবৃত্তি করলো।—শুন শুন হে পরাণ পিয়া...

কিছুক্ষণ আবিষ্টের মত নিঝুম হয়ে বসেছিলাম আমরা। বোধ হয় আমরা মনে মনে চির্‌কি মুর্‌মু নামে বনের লতার মত না-দেখা একটি মেয়েকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম—না, তোমার বন্ধু পালিয়ে যাবেনা। আমরা প্রার্থনা করছি, হোরো তোমার কাছে ফিরে যাবে।

ফাদার লিণ্ডনের গর্জন শুন্‌তে পেরে চম্‌কে উঠলাম। বোর্ডিংয়ের বারান্দায় অন্ধকারে যেন একটা ধস্তাধস্তি চলেছে। টুডু দৌড়ে গিয়ে ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখে ফিরে এল। সন্ত্রস্তের মত হাঁপাতে হাঁপাতে বললো।—ফাদার লিণ্ডন হোরোর বাঁশী ভেঙে দিয়েছে।

আমাদের সবার মনে একসঙ্গে ধক্‌ করে কতগুলি প্রতিহিংসার শিখা জ্বলে উঠলো। রাগের মাথায় বললাম।—ঘা কতক জমিয়ে দিতে পারলো না হোরো?

টুডু বিমর্ষ ভাবে বললে—আমারও কেমন ভয় হচ্ছে। হোরো বড় গোঁয়ার।

কিন্তু এর পর ষ্টীফান হোরোর গোঁয়ার্তুমির কোন প্রমাণ পেলাম না। বরং দেখলাম; গোঁ ধরেছেন ফাদার লিণ্ডন। ফাদার লিণ্ডনের অভিযান আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রতি সপ্তাহে একবার সফরে ষের হন। কখনো ভোজপুরী লেঠেল সঙ্গে যায়, কখনো বা আট দশটা কনেস্টবল। থানাতে একটা চিঠি দিলেই কনষ্টবল চলে আসে। যেন একটা যোদ্ধার দল নিয়ে ছুদিনের জন্য জঙ্গল এলাকায় অদৃশ্য হয়ে যান ফাদার লিণ্ডন। সত্যিই তিনি একজন ধর্মযোদ্ধা। আমরা শুধু? মনমরা হয়ে ভাবতাম—ফাদার লিণ্ডনের এই রহস্যময় আনাগোনা কবে বন্ধ হবে? কবে শান্ত হবে তাঁর লাল্‌চে মুখের উত্তেজনা?

টুডুর কাছে শুনে স্পষ্ট করে বুঝলাম—মোরাঙ্গি পাহাড়ের

সুরমুদের ডিহিতেই ফাদার লিগুনের অভিযান সুরু হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে এরই মধ্যে একটি মাটির গির্জা তৈরী করে ফেলেছেন। অরণ্যের বুকের ভেতর ঢুকে তিনি যেন লক্ষ বছরের বৃদ্ধ যত বোঙাদের শিলাময় বেদী কাঁপিয়ে দিয়ে এসেছেন।

খুব বেশী দিন পার হয়নি, শুনলাম, মেরাঙ্গি পাহাড়ে একটা হাঙ্গামা হয়ে গেছে। মাটির গির্জাটা ভেঙ্গে ধূলো করে দিয়েছে। কে করেছে?

যে করেছে, তাকে আমরা স্বচক্ষে একবার দেখলাম। বুড়ো সোখা। সেসন জজের অদালতের ভীড়ের মধ্যে মাথা গুঁজে আমরাও রায় শুনলাম —বুড়ো সোখার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

ষ্টীফান হোরোকে দেখতাম—বোর্ডিংয়ের বাগানে একটা বুড়ো বটের ঝুরিতে দোল্না বেঁধে সময় অসময় শুধু দোল খায়। দুলে দুলে যেন এক দুঃসহ গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে নিচ্ছে ষ্টীফান হোরো।

নন-কো-অপারেশনের ঝড় বইল সারা দেশে। আমরা স্কুল ছাড়বো। জালিয়ানওয়ালা বাগের অপমান আমাদের অশান্ত করে তুললো।

আমরা বাঙ্গালী আর বেহারী ছেলেরা স্কুল ছাড়লাম। রাজার ছেলেরা কেউ ছাড়লো না। খৃষ্টান ছেলেরাও নয়—টুডু টিগ্‌গা বেস্‌রা খাল্‌খো কেউ নয়। আমরা পিকেটিং করে ওদের বাধা দিতে লাগলাম।

আমাদের খুব ভরসা ছিল, হোরো আমাদের দলে আসবে। ফাদার লিগুন যেভাবে ওকে অপমান করেছে, জীবনে সে আর কোন পাদরী বা সাদা-চামড়াকে সহ্য করতে পারবে কি না সন্দেহ।

আমরা স্কুলের ফটকে পিকেটিং করছিলাম। দেখলাম হোরো আসছে —স্বতন্ত্র ভারত কি জয়! জয়ধ্বনি করে আমরা হোরোকে অভ্যর্থনা জানালাম।

হোরো এগিয়ে এসে ইন্দুকে একটা ধাক্কা দিল, পরেশের হাতটা ঠেলে

সরিয়ে দিল। বন শূয়রের মত গোঁ গোঁ করে পথ করে নিয়ে ক্লাসে গিয়ে ঢুকলো।

সেইদিন হোরোকে আমরা ভাল করে চিন্‌লাম। পাদরীদের ক্রীতদাস, মনুষ্যত্বহীন, মর্যাদাশূন্য, মূর্খ জংলী হোরো। স্বতন্ত্র ভারতবর্ষকে চিনলো না, একটু শ্রদ্ধা করলো না। চিনলো শুধু ওর জঙ্গলটাকে। কিন্তু তোর জঙ্গলটা যে ভারতবর্ষের মধ্যেই রে বনবৃষ! ভারতবর্ষের বাইরে তো নয়!

আট বছর পরের কথা। আমি লেপো থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা। সকাল বেলায় কজন বিরসাইট মুণ্ডা এসেছে হাজিরা দিতে। জেল থেকে আজই ওরা খালাস পেয়েছে। এখানে হাজিরা দিয়ে তারপর নিজের নিজের ডিহিতে চলে যাবে। বিরসাইট্‌রা অত্যন্ত সন্দেহভাজন জীব। প্রতি বছর হাঙ্গামা বাধায়। পুলিশকে ব্যতিব্যস্ত করে। জঙ্গল আইন মানে না, মহাজনদের পিটিয়ে তাড়িয়ে দেয়, চৌকীদারী ট্যাক্স দিতে চায় না। বাজারে বসলে তোলা দেবে না। জমি ক্রোক করতে গেলে আদালতের পেয়াদাকে টাঙি নিয়ে কাটতে আসে। দু'বছর আগে একবার স্বরাজ ঘোষণা করেছিল বিরসাইট মুণ্ডারা। পাদরীকে মেরেছে, পুলিশকে মেরেছে, অনেকগুলি পুল ভেঙেছে। ওরমান্‌ঝির জঙ্গলে একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল ওদের সঙ্গে।

সব চেয়ে শেষে হাজিরা লেখাতে যে লোকটা উঠে এল তার নাম রুনন্‌ু হোরো।

ডায়েরীর ওপর থেকে চোখ তুলে লোকটার মুখের দিকে তাকালাম। তার মাথার চুলের জংলী খোঁপাটাও জটার চূড়ার মত হয়ে গেছে। গলায় একটা ভেলাফলের মালা, আদুড় গা, কোমরে ছোট একটি কাপড় জড়ানো। হাতে একটা কাঁসার বালা। এই প্রাগৈতিহাসিক সজ্জার মধ্যে শুধু এক যোড়া সুশানিত আধুনিক চোখ......।

বিস্ময় চাপ্‌তে গিয়ে তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বল্‌লাম।—ষ্টিফান হোরো।

লোকটা মিচ্‌কে হেসে বললো।—না না ঘোষ, আমি রুন্‌নু হোরো।

—তুমিও একজন বিরসাইট?

—আমি বির্‌সা ভগবানের শিষ্য।

—বির্‌সা ভগবান? সে কে?

—সে আমাদের গান্ধী ছিল ঘোষ। আমি তাঁকে চোখে দেখিনি, আমার বাবার মুখে তাঁর কথা শুনেছি। ইংরেজের জেলখানার অন্ধকারে একজন কয়েদীর মত মরে গেছে আমাদের বির্‌সা ভগবান। তাঁর চেহারা দেখতে কেমন ছিল জান ঘোষ?

—কেমন?

—যীশু খ্রীষ্টের মত।

একটু চুপ করে থেকে হোরো বললো। —আমাদের জঙ্গলে বাইরে থেকে অনেক পাপ এসে ঢুকেছে, ঘোষ। তাই বির্‌সা ভগবান আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। তাঁর অনুরোধ কি ভুলতে পারি?

আমি ডাক্‌লাম। — ষ্টীফান হোরো...

হোরো প্রতিবাদ করলো। —বল, রুন্‌নু হোরো।

চুপ করে গেলাম। হোরো নিজে থেকেই খুসী হয়ে নানা খবর জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলো। —ইন্দু কোথায়? পরেশ কি করছে?

চারদিকে একবার সাবধানে তাকিয়ে নিয়ে হোরোকে প্রশ্ন করলাম। —এত রোগা হয়ে গেলে কেন হোরো?

হোরো। —আমার টি-বি হয়েছে। আচ্ছো, এবার যাই আমি।

একটা কথা জানবার জন্য মনটা ছট্‌ফট্‌ করছিল। তবু সঙ্কোচ

কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। শেষে সাহস করে বলেই ফেললাম। —একটা খবর জানতে বড় ইচ্ছে করছে হোরো !

হোরো। —বল।

জিজ্ঞাসা করলাম। —চিরকি মুরমু কোথায় ?

হোরো শান্তভাবে উত্তর দিল। — ও; জান না বুঝি। ফাদার লিণ্ডনের মিশনে চলে গেছে চিরকি। খৃষ্টান হয়েছে। এখন হাজারিবাগের কনভেণ্টে থাকে।

হোরো চলে গেল। কাউকে হয়তো মুখ ফুটে বলবো না, কিন্তু মনে মনে জানি, চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধেও আমরা আপাততঃ হেরে গেছি।



[সোখা—ওঝা বা পুরহিত। বুরু—জাতীয় মেলা। ইলি—নতুন মহুয়ার মদ। ওরা—কুমারীদের শয়নশালা। সেণ্ডেরা—জাতীয় শিকার উৎসব]



মা হিংসীঃ

"অজস্র প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, আসামী গিরধারী গোপ বর্তমান মামলার বহুদিন আগে থেকেই হিংস্র হয়ে উঠেছিল। বর্তমান মামলা আসামীর সেই বিকৃত জীবন ও স্বভাবের চরম পরিণাম। পৃথিবীতে পত্নী-নির্যাতক নামে এক ধরণের লোক দেখা যায়, আসামী গিরধারী বোধ হয় নিষ্ঠুরতায় সেই অপমানবদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর অন্যতম। প্রতিদিন ও প্রতি কথায় সে তার স্ত্রীকে অকথ্য প্রহার অত্যাচার ও নির্যাতন করতো।"

চারজন অ্যাসেসর অবিচল আগ্রহ নিয়ে ছোট ছোট বিষণ্ণ পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে বসেছিল, দায়রা জজের রায় শুনছিল।

রায় পড়তে পড়তে দু'তিন মিনিট পর পর দায়রা জজ যেন ঢোক গিলবার জন্য থেমে যাচ্ছিলেন। রুদ্ধ শ্বাসবায়ু মুক্ত করে দিয়ে নতুন বাতাসে দম ভরে নিচ্ছিলেন।

একটা শব্দহীন ভীড় আদালত কক্ষে জমাট হয়েছিল। প্রাণের ধুকপুক শব্দগুলি যেন প্রত্যেকের বুকের কোটরে আড়ষ্ট হয়ে আছে। প্রত্যেকের নিশ্বাস থেকে, প্রত্যেকের চোখের দৃষ্টি থেকে কিছুক্ষণের জন্য সকল চঞ্চলতার ধর্ম্ম নির্বাসিত। একটু নড়ে উঠলেই যেন এই মুহূর্তের শোকাক্রান্ত ছন্দের লয় ক্ষুণ্ণ হবে। শুধু ব্যস্ত হয়েছিল পাংখাকুলি—মেজের ওপর প্রায় চীৎপাত হয়ে শুয়ে, যেন আক্রোশের সঙ্গে অবিরাম পাখার দড়ি টেনে চলেছে। এজলাসের মাথার ওপর পাখার ঝালর একঘেয়ে শব্দ করে চলেছে—ঝট্‌পট্‌ ঝট্‌পট্‌ ঝট্‌পট্‌। আজকের কাহিনীর সকল যন্ত্রণাকে যেন ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিতে চায়।

এক একটা বিরামের পর, রায় পড়তে গিয়ে দায়রা জজের গলাটা অস্পষ্টভাবে ঘড়ঘড় করে, পরমুহূর্তেই বেশ স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে ওঠে।

"আসামী গিরধারী গোপের এই হিংস্রতার পিছনে একটা ইতিহাস আছে। আসামী ইচ্ছা করেই নিজেকে হিংস্র করেছিল, বেশ ভেবে-চিন্তে সে এই পথ ধরেছিল, তার মনের ভেতর একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। আসামী গিরধারী তার প্রতিবেশী সহদেব গোপের তরুণী পত্নী শনিচরীর প্রতি আকৃষ্ট ছিল। হাবেভাবে, ইঙ্গিতে এবং স্পষ্ট ভাষায় সে বহুবার শনিচরীর প্রতি প্রণয় প্রস্তাব করেছে। গিরধারীর ধারণা হয় যে, তার নিজ বিবাহিত পত্নী রাধিয়া যতদিন তার ঘরে আছে, ততদিন তার অভিলাষ সফল হবার আশা নেই। রাধিয়া তার পথের কাঁটা। রাধিয়ার ওপর আসামীর সকল অত্যাচারের রহস্য হলো, পথের কাঁটাকে সে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল।

"আসামী বলেছে যে, সে তার স্ত্রী রাধিয়ার চরিত্র সন্দেহ করতো। আসামীর সব সময় আশঙ্কা ছিল যে, রাধিয়া তাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টায় আছে। সেই হেতু আসামী তাকে মারধর করেছে, তাড়িয়ে দিতে চেয়েছে। আসামীর স্ত্রী রাধিয়া জেরার উত্তরে বলেছে যে, আসামী তাকে কখনো মারধর করে নি। এই দুই উক্তিই অবিশ্বাস্য।"

মুখ তুলে তাকালো গিরধারী। কাঠের খাঁচার মত আসামীর ডক, তার মধ্যে গুটিসুটি হয়ে সম্মুখের ঘটনার স্পর্শ থেকে নিজেকে আড়াল করে চুপ করে বসেছিল গিরধারী গোপ। জজ সাহেবের বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে একমাত্র ওরই যেন এতক্ষণ কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু হঠাৎ মুখ তুলে তাকিয়েছে গিরধারী। ওর দু'চোখে একটা অদ্ভুত রকমের কৌতুহল ফুটে উঠেছে। তার সমগ্র জীবনের এলোমেলো অর্থহীন ভাঙাটুকরা ভাষাগুলি সুন্দর একটা কাহিনী হয়ে গেছে। হোক্ না ইংরেজি ভাষা,

প্রত্যেকটি ধ্বনিতে একটা নতুনত্ব আছে। রাধিয়া! রাধিয়া! জজসাহের উচ্চারণ করছেন—এই নামটার কোন ইংরেজি করা যায় না। ঐ নামটাকে বদ্‌লানো যায় না।

"শেষ পর্যন্ত রাধিয়া টিঁকে থাকতে পারে নি। আসামীর হাতে নিগ্রহ অসহ্য হওয়ায় সে বাপের বাড়ি চলে যায়। তারপর এক মাসের মধ্যেই ঘটনা অন্যদিকে মোড় ফেরে।

"আসামীর প্রস্তাবে শনিচারী রাজী হয় নি। গত অক্টোবরের পয়লা তারিখে, ভোরবেলার কুয়াশার মধ্যে শনিচরী জল আনবার জন্য কলসী হাতে গ্রামের বড় ইঁদারার দিকে চলেছিল। পথের পাশে আখের ক্ষেতের ভেতর আসামী গিরধারী একটা হেসো নিয়ে অপেক্ষায় ছিল। ঠিক হিংস্র প্যান্থারের মত গিরধারী আখেব ক্ষেত থেকে লাফ দিয়ে বের হয়, শনিচরীর গলার ওপর হেসো দিয়ে তিনটে পোঁচ দেয়। শনিচরী সেইখানে দাঁড়িয়ে একবার চীৎকার করে,তারপরেই প্রাণহীন হয়ে পড়ে যায়।

"গিরধারী গোপ যখন পালিয়ে যাচ্ছিল, গ্রামের তিনজন চাষী তাকে দেখতে পায় ও চিনতে পারে। আসামী ফেরার হয়। পাঁচদিন পরে কাটিহার বাজারে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

"আসামী তিনবার অপরাধ স্বীকার করেছে, তিনবার অপরাধ অস্বীকার করেছে। সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ ও তদন্তের হিসাব নিলে এ বিষয়ে তিলমাত্র সংশয় থাকে না এবং সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, গিরধারী গোপ শনিচরীকে প্রতিহিংসাবশে খুন করেছে।

"এক্ষেত্রে আসামীর প্রতি সুবিচার করার জন্যই আমি তাকে চরম দণ্ড—প্রাণদণ্ড দিলাম।

ঝটপট, ঝটপট, ঝটপট—ঝালর লাগানো প্রকাণ্ড পাখাটা সশব্দে দুলছিল। আদালত ঘরে আর কোন শব্দ ছিল না। জনতা

শুধু নিস্পলক চোখে তাকিয়েছিল গিরধারী গোপের মূর্তিটার দিকে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স, রোগা চেহারার গিরধারী। চোখের কোন দুটো কালো, যেন বেশ মোটা করে সুর্মা লেপে দেওয়া হয়েছে। দুহাতে হাঁটু দুটোকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে পা দোলাচ্ছিল গিরধারী।

জজসাহেবের গলা ঘড়ঘড় করে উঠলো,—হিন্দী ভাষায় বললেন—"আসামী গিরধারী গোপ, তোমার অপরাধ সবুদ হয়েছে, তুমি মুসাম্মত শনিচরীকে খুন করেছ। মহামান্য সরকারের ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার নির্দেশমত আমি তোমাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম। তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে, যতক্ষণ না তোমার প্রাণ বাহির হয়।"

—বহুৎ আচ্ছা।

গিরধারী উত্তর দিল। শানিত বিদ্রূপের হিংসামাখা একটা ক্ষুদ্র প্রতিধ্বনি ক্ষণিকের জন্য যেন আদালত ঘরের স্তব্ধতাকে খান্ খান্ করে দিল। ডকের চারদিকে পুলিসেরা উঠে দাঁড়ালো। উকিল-মোক্তারের দল একে একে আসন ছেড়ে বাইরে চলে গেল। জনতা টলমল্ করে একবার ডকের দিকে কৌতুহলের আবেগে ঝুঁকে পড়লো। পুলিস বাধা দিয়ে জনতা সরিয়ে দিতে লাগলো—আগে চলো! আগে চলো! রাস্তা ছাড়ো, খবরদার!

কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া, গিরধারী গোপ আদালত-ঘর ছেড়ে হেঁটে চললো। তাব আগুপিছু দু'দিকে প্রহরী। দুপাশে তিন তিনজন করে বন্দুকধারী পুলিস। গিরধারীর প্রতিটি পদক্ষেপ শান্ত ও নির্ভুল। প্রহরীদের উৎকণ্ঠা ও ব্যস্ততার সীমা ছিল না। আদালতের সিঁড়ি থেকে অপেক্ষমান হাজতগামী পুলিশ-লরীটা পর্যন্ত বড় জোর দেড়শো গজ পথ। এইটুকু পথ পার হতে হাবিলদার তিনবার অ্যাটেনসন আর দশবার লেফট রাইট হাঁক দিল। ধুপ্-ধাপ বুট ঠোকাঠুকি চললো। তবু এতদিনের

প্যারেডে অভ্যস্ত পায়ের কদম বার বার ভুল হয় যায়। এদিকে দু'জন হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে যায় তো ওদিকে একজন হোঁচট খেয়ে পেছনে পড়ে থাকে। গিরধারীর কোমরের দড়ির এক প্রান্ত শক্ত করে মুঠোয় ধরে এমন জোয়ান চেহারার সিপাহীটাও মিছামিছি হাঁপায়। হাবিলদারের হাতের ছড়ির ইঙ্গিতের তালে তালে বন্দুকধারীরা শরীর দুলিয়ে এক ঢঙে কদম ফেলার চেষ্টা করে। স্বেদাক্ত কপালের রগ দপ্ দপ্ করে কাঁপে। বড় বেশী উৎকণ্ঠা, বড় বেশী উদ্বেগ, ভয়ানক রকমের দায়িত্ব। সাধারণ আসামী নয়। এক জঘন্য খুনের আসামী, এইমাত্র তার পরমায়ু নীলামে বিকিয়ে গেছে; তাই তার আজ এত দাম। তাই এত সাবধানতা। রোগা গিরধারী গোপের ছোট ফুসফুসটাকে লোহার আবরণ দিয়ে ঘিরে নিয়ে যেতে পারলেই ভাল ছিল। ওর গায়ে যেন এক কণা ধুলো না লাগে, ওর কানে যেন পাখির ডাকের শব্দ না পৌঁছয়। কে জানে কোথা থেকে কোন্ ফাঁকে কোন বে-আইনী সূর্যের রক্তমাখা আলোক ওর চোখের দৃষ্টিকে উতলা করে দেবে। হয়তো থমকে দাঁড়াবে, আকাশের দিকে তাকাবে, নড়তে চাইবে না। গিরধারীর জীবনে আজ এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ অবান্তর হয়ে গেছে। আলগোছে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে গিরধারীকে। ফাঁসীর আসামীর বুক যেন আনন্দে দুলে না ওঠে—ছিঁড়ে যেতে পারে। যেন চমকে না ওঠে—ফেটে পড়তে পারে। এত বড় মামলার ঘটা, আইনতুরুস্ত পৃথিবীর এত বন্দোবস্ত সব ভেস্তে যাবে। কোন রোগীকে, কোন মুমূর্ষুকে, কোন আহতকে এত সতর্ক সমাদরে কোন দিন তারা বহন করেনি।

পুলিশ লরীর ভেতর পা দিয়েই গিরধারী একবার বাইরের দিকে উঁকি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলো। কাউকে যেন সে খুঁজছে।

হাবিলদার ব্যস্তভাবে বললো, উঁহু, বসে পড়। দেখবার মত কিছু নেই।

গিরধারী হেসে ফেললো—আপনি ঠিক বলেছেন হাবিলদার সাহেব। আর দেখবার কিছু নেই, কেউ আসেনি।

আদালত এলাকার সীমা ছাড়িয়ে পুলিশ লরী দ্রুত বেগে দৌড়ে চলেছিল। প্রহরীরা যেন একটু স্বস্তি ফিরে পেয়েছে। আসামী লোক ভাল। কোন দৌরাত্ম্য করলো না। আসামী একেবারেই ছিঁচকাঁদুনে নয়, একবারও একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েনি, হাহুতাশ করেনি। এই ধরণের আসামীর হেপাজত নিতে বেশ ভাল লাগে। কোন হাঙ্গামা সইতে হয় না।

মাথার পাগড়ী খুলে পাশে রাখলো সেপাইরা। কপালের ঘাম মুছলো। গিরধারীর দিকে একটু করুণাভরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তারা বার বার তাকিয়ে দেখছিল। লোকটার প্রাণ বেশ পোক্ত ধাতুতে তৈরী। একটুও ঘাবড়ায়নি।

অর্জুন সিং বলে—শেষ পর্যন্ত এই রকম দেমাক নিয়ে টিঁকতে পারলে ভাল। কোন কষ্ট পাবে না।

হাবিলদার সন্দিগ্ধভাবে উত্তর দেয়—হুঁ।

ভগীরথী পাণ্ডে হাতের চেটোয় এক টিপ খৈনি নিয়ে জোরে জোরে মলতে আরম্ভ করে। প্রসঙ্গে যোগ দেয়—হ্যাঁ, আর ঘাবড়ে গিয়ে লাভ কি? জোরসে রাম নাম কর, সখসে ঝুলে পড়। ভয় করার কিছু নেই।

ঠোঁট কুচকে গিরধারী আর একবার হাসলো। সেপাইদের দিকে তাকিয়ে যেন একটু তাচ্ছিল্য করেই বললো—আপনারা কেন এত মাথা ঘামাচ্ছেন? মনে হচ্ছে, আপনারাই ঘাবড়ে গেছেন। বড় বেশী প্রেম দেখাচ্ছেন। কিন্তু জেনে রাখুন, আমি ফাঁসি যাব না।

সিপাহীরা একটু অপ্রস্তুত হয়ে শুকনোভাবে হাসতে লাগলো—মাপ কর ভাইয়া। বেশ, তোমার কথাই সত্যি। তোমার সঙ্গে তর্ক করার ইচ্ছে নেই আমাদের।

হাবিলদার গিরধারীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তীব্র একটা দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে রইল। তার পরেই পাশের সেপাইয়ের কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বললো—দেখছো তো ওষুধ ধরে গেছে। এরই মধ্যে মাথার গোলমাল শুরু হলো। হতেই হবে, মানুষ তো আর লোহার তৈরী নয়।

কনষ্টবল সাকির আলী বলে—বোধ হয় আপীল করবে বলে ঠিক করেছে।

হাবিলদার ঠাট্টা করে—হুঁ, আপীল করবে! ওর সংসার বিক্রী করলে দশটা টাকাও হবে না। এক নম্বরের দরিদ্দর, আপীল করবে কোথা থেকে?

অর্জুন সিং—তবে ও কি বলতে চায়?

হাবিলদার—বলছে 'ওর মাথা আর মুণ্ডু। বুদ্ধি বিগড়ে যাচ্ছে, আর কদিনের মধ্যেই......

গিরধারী এক টিপ খৈনি চায়। হবিলদার একটু সহৃদয়ভাবেই আপত্তি করে—মাপ কর বাবা।

গিরধারী আবার ঠাট্টা করে—দিয়ে ফেলুন সিপাহিজী, আমি এখনি মরছি না। কোন ভয় নেই আপনাদের, হাজত পর্যন্ত বেঁচে বেঁচেই পৌঁছে যাবে। আপনার মাথার পাথর নেমে যাবে।

সেপাইরা সবাই চুপ করে থাকে। হাবিলদার বলে—আমাদের কাছে মেহেরবাণী করে কিছু চেয়ো না গিরধারী। এই তো আর কিছুক্ষণের মধ্যে হাজত পৌঁছে যাবে। জেলরবাবুর কাছে আর্জি করো, যা চাইবে সব পাবে।

গিরধারী অহংকারের সুরে উত্তর দিল—কিছু আমি চাইব না। কিছু দরকার নেই। আমি সব পেয়ে গেছি। বড় খুসী লাগছে সিপাহিজী।

প্রহরী পুলিশদের মধ্যে কানকানি আলোচনা হয়—এত টনটনে জ্ঞান

ভাল নয়। এরাই শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ে। এখন তো শুধু জেদের জোরে ফরফর করছে—লম্বা লম্বা বুলি ঝাড়ছে। আর দুটো দিন পার হোক, অন্ধ ভঁইসের মত গরাদে মাথা ঠুকবে, আর গোঁ গোঁ করবে। ফাঁসির শাস্তি, এ কি ঠাট্টার কথা রে ভাই।

গিরধারী বলে—আমি সব শুনতে পাচ্ছি সিপাইজি। যত খুসী আপশোষ করুন আপনারা। কিন্তু আমি জানি, আমার ফাঁসি হবে না।

গিরধারীর কথাবার্তায় পাগলামির কোন আভাষ নেই। কিন্তু এত জোর গলায় সে যে কথা বলছে, সেটা প্রলাপ ছাড়া আর কি হতে পারে? প্রহরীদের সংশয় আর কৌতূহল এক সঙ্গে মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠছিল। কোথা থেকে এই বিশ্বাস পেল গিরধারী?

মোটর লরি একটা চক পার হয়ে বাঁ দিকে মোড় ঘুরালো। মুখ ঘুরিয়ে ডানদিকের পথের দিকে যেন একটা তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি প্রসারিত করে গিরধারী কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। লাল কাঁকরের একটা কাঁচা সড়ক চলে গেছে এঁকে বেঁকে, দুপাশে দু'সার আম শাল আর তেঁতুলের ছায়া নিয়ে। অবাধ অবারিত মাঠের বুকের ওপর দিয়ে সড়কটা ডাইনে বাঁয়ে এক একটা ছোট ছোট গ্রাম ছুঁয়ে চলে গেছে—দিগ্বলয়ের কোণে গিয়ে যেন মিলিয়ে গেছে।

গিরধারী জিজ্ঞেসা করলো—এই রাস্তা কোনদিকে গেছে হাবিলদার সাহেব?

হাবিলদার—অনেক দূর চলে গেছে। রফিনগরের বাজার ছাড়িয়ে, বাবুঘাট থানা পার হয়ে একেবারে মুঙ্গের জেলায় গিয়ে পড়েছে। কেন বল তো?

গিরধারী—ছেদিতালাও গাঁ এই পথে পড়ে?

হাবিলদার—হাঁ। কিন্তু ছেদিতালাওয়ের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

গিরধারী—আমার শ্বশুরার ঐ গাঁয়ে।

প্রহরীর দল চাপা স্বরে এক সঙ্গে আপশোষ করলো—আর তোমার শ্বশুরার!

গিরধারী মুখ ঘুরিয়ে আবার ছেদিতালাওয়ের কাঁচা সড়কের দিকে স্থির দৃষ্টি তুলে তাকিয়েছিল। পুলিসদের কোন মন্তব্য বোধহয় কানে শুনতে পাচ্ছিল না গিরধারী। দূর সর্পিল পথের মাটির সঙ্গে গিরধারীর সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম যেন পাকে পাকে জড়িয়ে পড়েছে। ওর চোখেমুখে সেই রকম একটা মুগ্ধ আবেশ থম্‌থম্ করছিল।

আবার সোজা হয়ে বসতেই অর্জুন সিং প্রশ্ন করলো—সত্যি কথা বলতো গিরধারী, মেয়েটাকে তুমি খুন করেছিলে।

গিরধারী—হ্যাঁ, আমি আগেই ওকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, একদিন সব দেনা-পাওনার হিসাব নেব। যেদিন সুবিধা পেলাম, হিসেব নিয়ে নিলাম।

হবিলদার—বড় ভুল করেছিলে গিরধারী।

গিরধারী যেন ভুল বুঝতে পেরেছে, তেমনি অনুশোচনার সুরে জবাব দিল – হাঁ, হাবিলদার সাহেব, রাত্রিবেলায় একটু নিরালা জায়গাতেই কাজ খতম করা উচিত ছিল, কিন্তু সকাল হয়ে গেছে বুঝতে পেরেও রাগকে বোঝাতে পারলাম না। লোকে দেখে ফেললো। নইলে......।

খুন করেছে, তার জন্য কোন অনুতাপ নেই গিরধারীর মনে। এবিষয়ে সে নিজেকে আজও নির্ভুল মনে করে। শুধু ভুল—সে ধরা পড়ে গেছে। অপরাধীর দীনতা লজ্জা ও মর্মপীড়ার কোন চিহ্ন আবিস্কার করা যায় না গিরধারীর কথায়।

সাকির আলি আশ্চর্য হয়ে বলে—আমি বাস্তাবিক এই কথা ভেবে

আশ্চর্য হই, আজ পর্যন্ত কোন ফাঁসীর আসামীকে তার কসুরের জন্য দুঃখ করতে দেখলাম না।

হাবিলদার—আর দুঃখ করার মত ওদের মন থাকে না ভাই। নিজের কসুরের কথা ওরা এক দম ভুলে যায়।

অর্জুন সিং বলে—ফাঁসির হুকুম না হলে, মানুষের মত মনটা তবু থাকে। নিজেকে পাপী বলে বুঝতে পারে, এক আধটুকু আপশোস করেও। কিন্তু...।

হাবিলদার একটু সম্ভ্রম ও সঙ্কোচে আম্‌তা আম্‌তা করে বলে—একটা প্রশ্ন করবো গিরধারী, মাপ করো ভাই।

গিরদ্বারী—বলুন।

হাবিলদার—তোমার জেনানা রাধিয়া কি সত্যিই খারাপ হয়ে গিয়েছিল?

গিরধারীর মুখটা কঠিন হয়ে উঠলো, শান্তভাবে বললো—সে খবর সে জানে আর আমি জানি। আপনাদের শুনে কি লাভ?

হাবিলদার তীক্ষ্ণ মেজাজে বেশ চড়া গলায় বিদ্রূপ করলো—আরে তুমি তো দুনিয়াকে সে খবর শুনিয়ে দিয়েছ। নিজেই আদালতে আর পুলিসের কাছে বলেছ যে...।

গিরধারীর মুখটা অসহায়ের মত করুণ ও বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। যেন অনুনয়ের সুরে প্রশ্ন করলো—হাঁা, মেহেরবাণী করে বলুন তো হাবিলদার সাহেব, আমি কি বলেছি। আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

হাবিলদার—তুমি বলেছ যে, তোমার জেনানা রাধিয়া তোমাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করতো।

কথাগুলিকে যেন মনের সব আগ্রহ দিয়ে বরণ করে নিচ্ছিল গিরধারী। শুনতে শুনতে সারা মুখে এক বিচিত্র ধরণের পরিতৃপ্তির উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে

পড়ছিল। নৌকার ঘুমন্ত যাত্রী যদি হঠাৎ জেগে উঠে ঘাটের মাটি নিকটে দেখতে পায়, সকল ভরসার আনন্দে দীর্ঘ অপেক্ষার ক্লান্তি মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যায়, গিরধারীর দৃষ্টি সেই রকমের। এক প্রচণ্ড অন্ধকারের স্রোতের টানে অবধারিত অন্তিমের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে, কিন্তু গিরধারীর মনে কোন শঙ্কা নেই, তাব হাতের মুঠোয় যেন একটা শক্ত কাছির অবলম্বন রয়েছে—দূর তটভূমির হৃদয়ের এক কঠিন আশ্বাসের সঙ্গে বাঁধা। মাঠের পর-মাঠ পেরিয়ে আরও দূরে, মুঙ্গের রোডের এক পাশে ছেদিতালাও গ্রাম। গিরধারীকে ফাঁসির অপমান ও বেদনা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে, মিঠাতালাওয়ের এক মেটে ঘরের নিভৃতে একটা বুকভরা আকুলতা এখন প্রস্তুত হচ্ছে, উপায় খুঁজে বার করছে। সব বুঝতে পেরেছে রাধিয়া, এতখানি বুদ্ধি তার আছে।

সাকির আলি প্রশ্ন করে—কথাটা কি সত্যি ?

গিরধারী প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠে। ঘোর মিথ্যার আবরণ দিয়ে ঢাকা এই কথার অর্থটা কি ধরা পড়ে গেল ? সামলে নিয়ে বেশ শান্তভাবেই গিরধারী উত্তর দেয়—সত্যি না মিথ্যে, সে খবর আমি জানি আর সে জানে।

হাবিলদার মন্তব্য করে—এটা কিন্তু একেবারে মিথ্যে কথা বলেছ গিরধারী। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য জঘন্য একটা মিথ্যে কথা বললে, কিন্তু কোন লাভ হলো না, না বাঁচলো নিজের প্রাণ, না রইল নিজের স্ত্রীর ইজ্জৎ।

অর্জুন সিং কর্কশভাবে বলে—একবার ভেবে দেখলে না, কি ভাবলো তোমার বউ। বেচারী নিজের কানে তোমার ঐ কথা শুনেছে।

অনুযোগ আর ধিক্কার শুনে গিরধারী একটুও কুণ্ঠিত হয় না, তার চেহারায় উৎফুল্লতা যেন নতুন বিশ্বাসে আরও সজীব হয়ে ওঠে। মনের

ভেতর আদালত ঘরের ছবিটা অস্পষ্টভাবে দেখতে পায়। কালো কালো কতকগুলি নরমুণ্ড তাকে ঘিরে ধরে আছে। জজ আর উকীলেরা প্রশ্ন করছে, প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে গিরধারী—রাধিয়া আমাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করতো। আমি জানি একদিন না একদিন বিষ খাওয়াবে। আমি তাই……।

আদালত ঘরের এক কোণে নাকমুখ আঁচল দিয়ে ঢেকে বদ্‌রী চাচার পাশে চুপ করে বসেছিল রাধিয়া। গিরধারীর প্রলাপ শুনতে পেল। চোখ তুলে তাকালো গিরধারীর ধূর্ত মূর্তিটার দিকে। কয়েকটি মুহূর্তের মত চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে রইল। সব বুঝতে পেরেছে রাধিয়া। গিরধারীর শেষ কামনার নিবিড় আগ্রহ ঐ প্রলাপের আড়ালে কী স্পষ্ট ইসারা দিচ্ছে। রাধিয়ার হাতের কাঁচের চুড়িগুলি একবার শব্দ করে ওঠে। গিরধারীর সকল উদ্বেগ এক সাফল্যের গর্বে নিশ্চিহ্ন হয়ে উড়ে যায়। ফাঁসির মৃত্যুর অসম্মান থেকে গিরধারীর অন্তরাত্মা উদ্ধার পাবার জন্য যার কাছে আবেদন জানাচ্ছে, সেই আবছা ভাষার ষড়যন্ত্র পৃথিবী ধরতে না পারুক্, রাধিয়া নিশ্চয় ধরেছে।

জেলের ফটক দেখা যায়। বুড়ো বটের ছায়ায় ফটকের দাঁতগুলি অস্পষ্ট হয়ে আছে। ওপরে বটের পাতার আড়ালে শত শত বাদুড় ঝুলছে। নীচে বন্দুক কাঁধে শান্ত্রী পাইচারী করে। ফটকের পাশে একটা কাঠের ত্রিভুজের মধ্যে পেতলের ঘণ্টা ঝুল্‌ছে।

মোটর লরী ক্রমে মন্থর হয়ে ফটকের সামনে এসে একেবারে থামলো। খপ্ খপ্ করে মাথায় পাগড়ী গুঁজে, লাঠি খাতা বন্দুক আর গিরধারীকে নিয়ে প্রহরীরা বুড়ো বটের ছায়ায় দাঁড়ালো।

অর্জুন সিংয়ের মনটা একটু করুণাপ্রবণ রোমাণ্টিক ধরণের। গিরধারীর পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বললো—আর সময় নেই গিরধারী। এইবার

আমাদের হেপাজত ছেড়ে তোমাকে ভেতরে ঢুকে পড়তে হবে। ধরিত্রীকে প্রণাম করে নাও।

গিরধারী বিস্মিতভাবে অর্জুন সিংয়ের দিকে তাকালো। অর্জুন সিং বললো—সবাই করে ভাইয়া। নাও, তাড়াতাড়ি একটু ধূলো কপালে ঠেকিয়ে নাও। আর সুযোগ পাবে না।

ফটকের ছোট দরজাটা তখন কঁকিয়ে কঁকিয়ে খুলছে, গিরধারীর জীবনের রথ এসে পথের শেষে পৌঁছে গেছে। পেছনের দুনিয়ার মাটী সরে যাবে এই মুহূর্তে। গিরধারী জীবনে আর উল্টো রথের আশা নেই, চাকা ভেঙে গেছে। লোহার গরাদের ওপারে এক গভীর সুপ্তির জলকুণ্ড লুকিয়ে আছে, সেখানে প্রণাম করার মত মাটী পাওয়া যাবে না। অর্জুন সিং দুঃখিত হয়েই দেখছিল, গিরধারী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

হাবিলদার বললো—চল।

ঢং ঢং করে পাঁচটার ঘণ্টা বাজলো। বুড়ো বটের ছায়া লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ লরির ইঞ্জিনটা স্টার্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফোঁপাচ্ছিল। ফটকের মুখ থেকে বের হয়ে এসে প্রহরীর দল অলসভাবে আবার লরীর ভেতর একে একে উঠে বসলো—হাবিলদার, অর্জুন সিং, সাকির আলি...। গিরধারী নেই, জ্যান্ত গিরধারীর বাসি প্রাণ জেলরের কাছে জমা দিয়ে শুধু রসিদ নিয়ে ফিরে চললো প্রহরীর দল।

মোটর লরিটা আচম্কা একবার বাম্প্ করে দ্রুত দৌড়ে চলে গেল।

প্াঁচ হাত লম্বা পাঁচ হাত চওড়া নিরেট পাথর আর কংক্রীটের গাঁথুনি দিয়ে তৈরী খুপ্রির মধ্যে ভাগলপুরী কম্বলের ওপর শুয়ে সে রাত্রে গিরধারী কি স্বপ্ন দেখেছিল, তা কেউ জানে না। কিন্তু সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জেলের প্রত্যেক কর্মচারী, ওয়ার্ডার, শান্ত্রী আর কয়েদী বুঝতে পারলো—এক অতি দুর্দান্ত ফাঁসীর আসামীর আবির্ভাব হয়েছে। জেলর থেকে আরম্ভ করে

ওয়ার্ডার শান্ত্রী আর ডাক্তার—সবাইকে যা খুসী টিট্‌কারী দিয়েছে, গালাগালি করেছে। একেবারে বেপরোয়া আসামী। মেথরের সঙ্গে রসিকতা করে শালা সম্পর্ক পাতিয়েছে। স্থূলাকার শান্ত্রী পাঁড়েজীর একটা নতুন নামকরণ করেছে—বীর বৃকোদর।

তাঁতঘরের কয়েদীরা কাজ করতে করতে তখনো শুনতে পাচ্ছিল, সেলের মধ্যে ফাঁসীর আসামী গিরধারী গলা খুলে গান গাইছে—"নজরিয়া লুভায় লিয়ে যায়, মন তির্‌ছি! হাঁরে মন তির্‌ছি!"

কে জানে কিসের স্বপ্নে মাতোয়ারা হয়ে আছে গিরধারী। সারাদিন গোলমাল করে। চীৎকার ক'রে বলে—কোন্ শালা আমার ফাঁসি দেয়ে দেখ্‌বো।

বিদ্রূপ করে বলে—আহা! কত সখ। দড়িতে ঝুলিয়ে মারবে। পাগলা কুত্তা পেয়েছে, না?

প্রতিদিন খাবার নিয়ে হাঙ্গামা করে গিরধারী। এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়েই থু থু করে ফেলে দেয়।

সন্ধ্যে হতেই চেঁচামিচি আরম্ভ করে—মশারী চাই। উঃ কি ভয়ানক মশা! যেমন জেলের লোকগুলি তেমনি মশাগুলি।

শান্ত্রী পাঁড়েজি মেজাজের ধৈর্য কষ্ট করে অটুট রাখে। শান্তভাবেই বোঝাতে চেষ্টা করে—এই রকম গোলমাল করো না, সব পাবে। ঘুমোও, ঘুমোও।

আরও কিছুক্ষণ দাপাদাপি করে একটু শান্ত হয় গিরধারী, ঝিমোতে থাকে, তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। গরাদের বাইরে পাঁড়েজির একটানা প্রহরা ও বুটের শব্দ অন্ধকারে মচ্‌মচ্ করে। ঘণ্টা বাজে। পাহারা বদল হয়। ঘুমন্ত গিরধারীর বুকের প্রতিটি স্পন্দনকে সযত্নে পাহারা দেবার জন্য নতুন শান্ত্রী আসে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বসে গিরধারী। জিজ্ঞেস করে—কত রাত হলো?

—এগারটা। চুপ করে ঘুমোও। শান্ত্রী দিল্‌বর মিঞা উত্তর দেয়।

গিরধারী তবু জেগে জেগে কিছুক্ষণ উসখুস করে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে অঘোরে। সমস্ত পৃথিবীর জীবনযন্ত্রের ছন্দের সঙ্গে নিশ্বাস প্রশ্বাসে তাল রেখে কোটী কোটী মানুষের মত ঘুমোতে থাকে গিরধারী।

দু'মিনিট পরেই জেগে ওঠে; শান্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে—খুব ভাল ঘুম হলো সিপাহীজী! আঃ!

দিল্‌বর মিঞা বলে—আবার ঘুমাও।

গিরধারী বিরক্ত হয়ে ওঠে—আর কত ঘুমোব সিপাহীজী!

লাল চিঠি এসে গেছে—হাইকোর্টের সহি এসে গেছে। ওয়ার্ডার আর শান্ত্রীরা সকলেই সে খবর রাখে। গিরধারীর আয়ুর মুহূর্তগুলির মাত্রা বাঁধা হয়ে গেছে।

ব্যারাকের রসুইঘরে রান্না করতে করতে সিপাইরা আলোচনা করে—দুদিন থেকে গিরধারী গোপ একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আরও ঠাণ্ডা হওয়া এখনো বাকী আছে। এখনো কিছু কিছু ইয়ার্কি করে।

—এখনো ওর বিশ্বাস যে ওর ফাঁসি হবে না।

—তাই ভাল, তাই ভাল। ঐ বিশ্বাস নিয়েই বাকি কটা দিন পার করে দিক্।

—যাই বল, গিরধারী গোপ কিন্তু বড় শক্ত খুনী। এদের যাওয়াই ভাল।

—আরে নেহি ভাই, তাতে কোন লাভ হয় না।

—সব খুনীর যদি ফাঁসি হতো তবে না হয় বলা যেতো যে একটা নিয়ম আছে।

—যারা খুন করে ধরা পড়ে, তারই শুধু ফাঁসী হয়।

—ভেজাল খাবার খাইয়ে কত লোককে খুন করা হচ্ছে, তাদের তো কই ফাঁসী হয় না?

—উল্টে তাদের লাইসেন্স দেওয়া হয়।

—গাঁজা আফিম খেয়ে কত লোক রক্ত শুকিয়ে মরে যায়। কই, কেউ তো বাধা দেয় না, বিচার করে না?

—কত লোকে ফুর্তি করে মোটর গাড়ি চালিয়ে কত লোক মারে।

—কিন্তু জেনে শুনে তো মারে না ভাই, ভুল করে মারে।

—আরে হাঁ হাঁ। সব খুনেই ভুল করে হয়। মেজাজের ভুল।

শান্ত্রী পাঁড়েজি পাহারায় এসে দেখে, গিরধারী ধীর স্থির হয়ে বসে আছে। এই রকম দৃশ্যই পাঁড়েজি আশা করেছিল। মৃত্যুর ফাঁদে পড়ে প্রত্যেক অভিশপ্ত প্রাণ প্রথম কয়েকটা দিন যেন দুরন্ত হয়ে ওঠে, বিদ্রোহ করে। তার পরেই ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ে। শত আশ্বাসে ও প্রেরণায় তখন তাকে আর ঠেলে তোলা যায় না।

পাঁড়েজি বললো—খবর তো এসে গেছে গিরধারী।

গিরধারী—হ্যাঁ, পাঁড়েজি।

পাঁড়েজি—বাস্, ভয় করবার কিছু নেই। প্রেমসে রাম নাম কর।

গিরধারী শান্ত ভাবেই উত্তর দিল—আপনি সান্ত্বনা দেবেন না পাঁড়েজি, আমার ফাঁসী হবে না।

শান্ত্রী পাঁড়েজি চুপ করে গেল। এখনো মুক্তির স্বপ্ন দেখছে গিরধারী। সব দিকে এত টন্‌টনে জ্ঞান, শুধু এই একটি ক্ষেত্রে একেবারে অপোগণ্ড শিশুর মত সে বোকা। এর কোন কারণ খুঁজে পায় না পাঁড়েজি। হয়তো মাথায় দোষ দেখা দিয়েছে গিরধারীর।

গিরধারী বলে—আমাকে এক টুকরো খড়ি যোগাড় করে দিতে পারেন পাঁড়েজি ?

পাঁড়েজি—কেন ?

গিরধারী—ছবি আঁকবো।

পাঁড়েজি—জেলর বাবুকে বলবো।

গিরধারী—জেলের গরুগুলি এত রোগা কেন পাঁড়েজি ?

পাঁড়েজি—আমি জানি না।

গিরধারী—নিশ্চয় ভাল করে খাওয়ানো হয় না।

পাঁড়েজি—জানি না, আমি গয়লা নই।

গিরধারী—জেলরবাবু আসুক, আচ্ছা করে শুনিয়ে দেব।

গিরধারী কয়েকটা দিন আর গান গায়নি। শুধু বার বার প্রশ্ন করে—কটা বেজেছে সিপাহিজী ? আজ কত তারিখ ?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক এক সময় নিঝুম হয়ে থাকে গিরধারী। অন্তর্লোকের পথে যেন কারও পায়ের শব্দ শুনছে। সে আসছে, সে এতক্ষণ রওনা হয়ে গেছে। আর কত দেরী করবে ? ছেদিতালাও থেকে লাল কাঁকরের সড়ক ধরে হেঁটে হেঁটে শান্তিময় মৃত্যুর উপঢৌকন নিয়ে রাধিয়া আসবেই। তার ইসারা বুঝতে কি ভুল করবে রাধিয়া ? অসম্ভব। খুব চালাক মেয়ে রাধিয়া। জীবনের সব কাজে রাধিয়া গিরধারীকে সাহায্য করেছে। শুধু একটি ক্ষেত্রে পারেনি। রাধিয়ার জীবনের তৃপ্তির একটি মাত্র অভিশাপ, একটি মাত্র বাধা, তাকেও হেসো দিয়ে নির্মূল করে দিয়েছে গিরধারী। তবে আর কেন ? এখন তো পথে আর কোন কাঁটা নেই। স্বচ্ছন্দে রাধিয়া চলে আসতে পারে।

গিরধারীর বিশ্বাস অবিচল থাকে। রাধিয়া ঠিক সময় মত পৌছে যাবে। ফাঁসীর মৃত্যু থেকে রাধিয়া তাকে মুক্তি দেবে।

গিরধারীর স্বপ্ন বোধ হয় মিথ্যে হতে চলেছে। জেলর ও ডাক্তার এলেন সেলের কাছে। গিরধারীর ওজন নেওয়া হলো।

কোন প্রশ্ন করার আগেই জেলের জানিয়ে দিলেন—কাল তোমার ফাঁসির দিন, গিরধারী গোপ।

গিরধারী চুপ করে রইল। জেলর বললেন—যা খেতে টেতে চাও বল, সব মিলেগা।

গিরধারী জবাব দিল—কিছু না।

সেলের দরজা বন্ধ হলো।

দুপুর পর্যন্ত সেলের মেজের ওপর গিরধারীর শীর্ণ মূর্তিটা কুঁকড়ে পড়েছিল। দেয়াল মেজে ছাত—সব নিরেট, কোথাও একটা ফুটো নেই যে সাপ হয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়। কয়েদীদের খাওয়া হয়ে গেছে, কাকের ঝাঁক এঁটো খাওয়ার জন্য কলরব করে উড়ে বেড়াচ্ছে বাইরে—শব্দ শোনা যায়।

সেলের দরজা খুলে দিল্বর মিঞা এসে খবর দিল—মোলাকাতে চল। তোমার জেনানা এসেছে।

না, স্বপ্ন মিথ্যে হয়নি। এক লাফে উঠে দাঁড়ালো গিরধারী। মেজের ওপর কম্বলটাকে এক লাথি মেরে পেছনে সরিয়ে দিল। গিরধারী যেন সব বন্ধন ছিন্ন করে চলেছে। আর এখানে ফিরে আসতে হবে না।

অফিস ঘরের পাশে, একটা গরাদের ওপারে এসে বসলো গিরধারী। একজন ওয়ার্ডারের সঙ্গে রাধিয়া ঢুকলো অফিস ঘরে।

এক দৌড়ে এসে গরাদের ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো রাধিয়া। মেজের ওপর ঢপ করে একটা প্রণাম করলো।

ফুঁপিয়ে কাঁদছিল রাধিয়া। চরম বেদনা ও হতাশার একটা প্রতিধ্বনি

যেন টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। রাধিয়া বলছিল—ছিনিয়ে নিলে গো। তোমার খাবার ছিনিয়ে নিলে।

অতি নগন্য খাবার জিনিস, একটুখানি গুড়ের হালুয়া আর একটা পেঁড়া পাতায় মুড়ে নিয়ে এসেছিল রাধিয়া। কিন্তু সে সাধ সফল হয়নি। ফটকের শান্ত্রীর কাছে জমা রেখে আসতে হয়েছে।

জেলর রাধিয়াকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন—এর জন্যে এত কান্না কেন? আরও ভাল খাবারের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। তুমিই নাম কর, কি খাওয়াতে চাও। রসগোল্লা জিলিপী......।

গিরধারী তাকিয়েছিল অদ্ভুত ভাবে। একটা মৃত মানুষের মূর্তির মধ্যে চোখের কোটর দুটো যেন হাঁ করে রয়েছে। সে দৃষ্টিতে কোন অর্থ নেই, ভাষা নেই, আবেগ নেই, জ্যোতি নেই। আজ এতদিনে সত্যিকারের ফাঁসির হুকুম শুনতে পেয়েছে গিরধারী। রাধিয়া নিজের হাতের তৈরী মধুর মৃত্যুর উপহার হাতের নাগালে পৌছলো না। গিরধারীর মেরুদণ্ডটা কাঁপছে, বেঁকে যাচ্ছে, কট্‌কট্‌ করে বাজছে, জীবনকাঠি ভাঙছে।

ভয়ার্ত ছোট ছেলের মত হাঁউ হাঁউ ক'রে কেঁদে উঠলো গিরধারী।—বাঁচাও রে বাবা! বাঁচিয়ে দে রে বাবা!

সবাইকে আশ্চর্য করলো গিরধারী। অদ্ভুত। গিরধারীর মত এত শক্ত আসামী, হঠাৎ এভাবে ভেঙে পড়ে কেন?

কেরাণীবাবু ঘড়ি দেখলেন। মোলাকাতের সময় শেষ হয়ে গেছে। দু'জন ওয়ার্ডার রাধিয়ার হাত ধরে ফটকের বাইরে টেনে নিয়ে গেল।

সমস্ত জেলের কয়েদী আশ্চর্য হয়ে শুনলো ফাঁসির আসামী গিরধারীর ব্যাকুল চীৎকার আর কান্না। বধ্যভূমির গন্ধ পেয়ে একটা পশু যেন সেলের ভেতর আর্তনাদ করছে।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। শাস্ত্রী পাঁড়েজি পাহারায় আছে। কান্না থামিয়ে গিরধারী কম্বলের ওপর মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছিল।

রাত্রি আর অন্ধকার ক্রমে ঘনিয়ে উঠলো। সব নম্বর বন্ধ হলো। দেখা যায়, কলঘর থেকে একটু দূরে খোলা মাঠের ওপর নতুন একটা বাতি জ্বল্‌ছে। ফাঁসির তক্তা পাহারা দিচ্ছে শাস্ত্রী। ঠিক আছে, সব ঠিক আছে।

দড়ি পরীক্ষা হয়ে গেছে। তিন মণ ওজনের বালির বস্তা ঝুলিয়ে দড়ির শক্তি টেস্ট করা হয়েছে। পোষা অজগরের মত চর্বি-মাখানো দড়িটা এখন গুটিয়ে পাকিয়ে পড়ে আছে অফিস ঘরের একটা সিন্ধুকে—তালাবদ্ধ হয়ে।

আর এক নম্বরের কুঠরিতে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছে জহ্লাদ বংশী দোসাদ। ফাঁসি প্রতি পাঁচ টাকা রেট। আজ রাত শেষ হয়ে সকাল হতেই বংশী দোসাদের রোজগারের হিসাবে পাঁচ টাকা জমা হবে।

জেলখানার মাথার ওপরের অন্ধকারে পাখার বাতাস দিয়ে, বুড়ো বটের পাতার ভীড় ছেড়ে মাঝে মাঝে বাদুড়ের ঝাঁক উড়ছিল। টর্চ হাতে নিয়ে জেলর আর হাবিলদার শাস্ত্রী রাউণ্ড দিয়ে গেলেন। সব ঘুমিয়ে পড়েছে, প্রত্যেকটি নম্বর নিঝুম। তাঁতখানা, কলঘর, ঘানি—তারপর বাঁ দিকে ঘুরে ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে সেলের কাছে পৌঁছলেন।

গিরধারী উঠে বসে সেলাম জানালো।

জেলর জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছ? ঘুম হয়েছে?

গিরধারী—হ্যাঁ, বাবু।

জেলর—তবিয়ৎ ভাল আছে।

গিরধারী—হাঁ বাবু।

জেলর—খেয়েছ?

গিরধারী—হাঁ বাবু।

জেলর—বেশ বেশ। এখনও অনেক রাত আছে ঘুমোও।

জেলরবাবু চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে আর একবার দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেসা করলেন—তোমার কিছু বলবার আছে ?

গিরধারী চুপ করে রইল। তার পর বললো—না।

জেলরবাবু চলে যাচ্ছিলেন। গিরধারী ডাকলো—বাবু!

জেলর—বল।

গিরধারী—রোজ রাত্রিবেলা বাইরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান হয় শুনতে পাই, কে গায় ?

জেলর—আমার মেয়েরা গায় ?

গিরধারী—আজ কিন্তু দিদিদের গান শুনতে পেলাম না বাবু।

জেলর একটু অপ্রস্তুত হয়ে কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বাইরে চলে গেলেন। সেলের সাম্‌নে ডবল শান্ত্রীর পাহারা অন্ধকার আগলে দাঁড়িয়ে রইল।

গিরধারী নিঃশব্দে বসে রইল। শান্ত্রী পাঁড়েজি বললেন—ঘুমোবার চেষ্টা কর গিরধারী।

গিরধারী বললো—কিছু তুলসীবচন শোনাতে পারেন পাঁড়েজি ?

পাঁড়েজি—রাম নাম কর গিরধারী। তুলসীবচনের সার হলো রাম নাম। কোন ভয় নেই।

সীতারাম! সীতারাম! নিশ্বাসের সঙ্গে আস্তে আস্তে নাম উচ্চারণ করলো গিরধারী।

ভোরের আব্‌ছা অন্ধকারে জেল কম্পাউণ্ডের বাইরে সড়কের ওপর গাছ তলায় চুপ করে বসেছিল রাধিয়া। একটা কুপিতা নিশাচরী মূর্তি যেন সময় গুণতে গুণতে ভোর করে ফেলছে। আর পালিয়ে যেতে

পারেনি। রাধিয়ার কাপড় ধুলোয় লাল হয়ে গেছে। রুক্ষ চুলগুলি এলোমেলো হয়ে আছে। সারা রাত যেন জেলখানার প্রত্যেকটি শব্দকে উৎকর্ণ হয়ে পাহারা দিয়েছে, চোখের পলক ফেলেনি। চোখ ছুটো ফুলে লাল হয়ে আছে। রাধিয়ার আঁচলে কয়েকটি শ্বেতকৌড়ি আর খই পুঁটলি করে বাঁধা। পাশে একটা মেটে কলসী, জলে ভরা।

ফটকের আলো নিভলো। জেলখানার মাঝখানে একটা গাছের মাথায় সারা রাত আলোর ছটা লেগেছিল। সে আলোও নিভেছে, রাধিয়া দেখতে পায়।

ফটকের ভেতর দিয়ে লোক আসা যাওয়া করছে। ভোরের কাকের দল শব্দ করে পূব আকাশের দিকে ছুটেছে।

সীতারাম! সীতারাম! সীতারাম! মানুষের বুক থেকে একটা আর্ত মন্ত্রের শব্দ ছিট্‌কে বের হয়ে জেলখানার বাতাসে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে।

রাধিয়া জলের কলসী হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ফটকের দিকে এগিয়ে চললো।

সীতারাম! সীতারাম! সীতারা......।

এক অদৃশ্য সেতারের তার হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। হুমম্‌—হ্যাঁচ্‌কা টানে একটা ভাষাহীন বোবা যন্ত্রণা যেন নিমেষের মধ্যে পৃথিবীর বুকের ভেতর ঢুকে পড়লো।

ফটকের কাছে একটা গরুর গাড়ি দাঁড়িয়েছিল লাস বয়ে নেবার জন্য। রাধিয়া ফটকের কাছে এসে দাঁড়াতেই শাস্ত্রী বললো—বসো, লাস আসছে।

লাস এল—কম্বলে জড়ানো গিরধারী।

রাধিয়া বললো—কম্বল সরাও। আমি ওকে একবার দেখবো।

ডোমেরা কম্বলের ঢাকা সরিয়ে দিতেই, চম্‌কে কপালে হাত দিয়ে এক ঠায় দাঁড়িয়ে রইল রাধিয়া। গিরধারীর আধ হাত লম্বা জিভ আর দড়ির

মত লিকলিকে গলাটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ দুটো জোরে ঘসে নিয়ে চারদিকে তাকালো।

সমস্ত পৃথিবীকেই আড়চোখে একবার দেখে নিল রাধিয়া। বুক ফেটে চরম ধিক্কার বের হয়ে এল—ছি ছি, একি চেহারা করে দিয়েছে রে। এর চেয়ে আমার বিয়ের হালুয়া যে ঢের ভাল ছিল রে!

বলতে বলতে কেঁদে ফেললো রাধিয়া।

কি বলছে? কি বলছে? ওয়ার্ডারেরা একে একে এসে রাধিয়াকে ঘিরে দাঁড়ালো।

এক আছাড় দিয়ে জলের কলসীটা ফটকের সামনে ফাটিয়ে দিল রাধিয়া। আঁচল থেকে শ্বেতকৌড়ি আর খই বের করে ছিটিয়ে দিল।

শেষ ব্রত সাঙ্গ হয়েছে রাধিয়ার। রাধিয়া আর ফিরে তাকালো না। ওয়ার্ডারদের পাশ কাটিয়ে দৌড়ে চলে যাবার জন্য চেষ্টা করলো।

ওয়ার্ডারেরা বললে—দাঁড়াও, পালিয়ো না। জেলরবাবু আসুক, পুলিশ আসুক। ইস, কী সাংঘাতিক মেয়েমানুষ।

মৃত্যুঞ্জয়

ডায়মণ্ড হারবার

১৩ই আগষ্ট ১৯৪২

শ্রীরমা দেবী

প্রীতিভাজনীয়াসু—

আপনার চিঠি পেয়েছি। শুধু ভাবছি, এর মধ্যে আমার কতটুকু করবার আছে? তবে এ বিশ্বাস রাখবেন, আমার যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করবো। আপনার চিঠির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন অনুযোগের আভাস যেন পেলাম, এই দুর্ঘটনার জন্যে আমিও নাকি ধর্মতঃ অনেকখানি দায়ী। আপনার অনুযোগটা একটু কঠোর হয়েছে এবং মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। অবশ্য আমি সহজেই অনুমান করে নিতে পারি, আপনি কতটা অস্থিরতার মধ্যে আছেন। এই রকম মানসিক অবস্থায় যুক্তি ও চিন্তার ভুল হওয়া স্বাভাবিক। অজিতের আচরণ আমিও সমর্থন করি না। হঠাৎ এভাবে অন্তর্দ্ধান হওয়া তার পক্ষে কি করে যে সম্ভব হয়, তারও কোন মীমাংসা খুঁজে পাই না। অজিত আমার বন্ধু, তার সম্পর্কে আমার মনে প্রীতি ও ক্ষমার অবকাশ আছে এবং তার সীমাও আছে। কিন্তু অজিত আপনার স্বামী—অজিতের ওপর আপনার মনে প্রীতি ও ক্ষমার কোন সীমা না থাকারই কথা। আপনাদের বিয়ের আগে আপনাদের দু'জনারই মনের পরিচয় আমি কিছুটা জানতে পেরেছিলাম। আপনাদের দু'জনের মধ্যে ভালবাসার সীমা নেই বলেই আপনারা জানতেন, বলতেন এবং লিখতেন। আপনাদের বিয়ের আগে অজিতের মুখে প্রতিদিন শুনেছি—জীবনে কাকে

পেলে সে সুখী হবে। আপনাদের বিয়ের পরেও অজিতের মুখে শুনেছি—জীবনে কাকে পেয়ে সে সুখী হয়েছে।

সেই জন্যই আজ আমি আপনাদের দু'জনেরই আচরণে বিস্ময় বোধ করছি এবং ক্ষুণ্ণও হয়েছি। আপনার সব আগ্রহ ও আপত্তি অবাধে তুচ্ছ করে অজিত পালিয়ে গেল কেন? আপনিও এই সাময়িক একটা আঘাতকে তুচ্ছ করতে না পেরে একেবারে জীবনের প্রথম সত্যের মর্য্যাদাকে আঘাত করে বসলেন? আমাকে অনুযোগ করলেন, কারণ আমি আপনাদের বিয়ের ব্যাপারে একজন উদ্যোগী ছিলাম। এই প্রচণ্ড মন্তব্য করবার এখুনি এমন কি প্রয়োজন ছিল? অজিত হয়তো একটা ভুল করে ফেলেছে, সেজন্য সরাসরি তার স্বামিত্বের দাবীকেই এভাবে প্রশ্ন করা আপনার পক্ষে অশোভন হয়েছে। যেন এ বিয়ে না হলেই ভাল ছিল, আপনি রাগের মাথায় এই রকম একটা কঠোর কথা বলবার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু কি এমন ভয়ানক অন্যায় করেছে অজিত? আপনি আগেও জানতেন যে অজিতের পলিটিক্সের বাতিক আছে। হয়তো সেই বাতিকটা হঠাৎ একটু উগ্র রকমের হয়ে উঠেছে। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। সেজন্য আপনার পক্ষে এতটা বিচলিত হওয়া সাজে না।

আমি খোঁজ করছি, কোথায় গেল অজিত। খুঁজে তাকে বের করবোই, সেজন্য আপনি চিন্তা করবেন না।

শুভানুধ্যায়ী, শ্রীকান্ত রায়

(২)

ডায়মণ্ড হারবার

২৪শে অক্টোবর ১৯৪২

শ্রীরমা দেবী

প্রীতিভাজনীয়াসু—

নিমাইপুরের দিকে গিয়েছিলাম। কাল ফিরেছি। আপনার আরও অনেকগুলি চিঠি পেলাম। আপনার চিঠিগুলি পড়ে যদিও বিব্রত বোধ করছি, কিন্তু আপনার সাহসের প্রশংসা করি। আপনার বক্তব্য আপনি অকপটে বলেছেন। আপনার কোন যুক্তি খণ্ডন করার মত প্রতিযুক্তি পাচ্ছি-না। আপনার ক্ষোভ মিথ্যে নয়। অজিত দেশপ্রেমিক হতে পাবে, পলিটিক্সওয়ালা কর্মী হতে পারে, কিন্তু জীবনের যাত্রাপথের আরম্ভেই তার সঙ্গিনীকে একাকিত্বের শূন্যতার মধ্যে এভাবে ফেলে দিয়ে চলে যাবার অধিকার নেই। আমি আপনার অভিযোগ সমর্থন করি; অজিতের পক্ষে এটা পৌরুষ নয়, শুধু তাই নয়, আমার আরও সংশয় হয়, এটা দেশপ্রেমিকেরও লক্ষণ নয়। তবু অনুরোধ, এই বেদনা শান্তভাবে সহ্য করার চেষ্টা করবেন।

নিমাইপুরের দিকে গিয়েছিলাম। আরও পঁচিশটা গ্রাম ঘুরেছি। অজিতের দেখা পাইনি, কিন্তু ওর সাড়া শুনে এসেছি। গাঁয়ের মাঠের কাদায় ওর পায়ের ছাপ এখনো শুকিয়ে স্পষ্ট হয়ে আছে। সকলেই ওকে চেনে! সকলেই ওকে মান্য করে। সকলের কানে কানে অজিত মন্ত্র প'ড়ে দিয়ে গেছে। চারদিকে তারই প্রতিধ্বনি ছুটাছুটি করছে, দেখে এলাম। আপনি বোধ হয় জানেন, দেশের সর্বত্র একটা হাঙ্গামা বেধেছে। লোকগুলিও ক্ষেপে উঠেছে, মরতে তিলমাত্র ভয় করে না। গোলা গুলি চলেছে, তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। মাসখানেক আগে এই নিমাইপুরে অজিত একটা সভা করেছিল, পঁচিশটা গ্রামের লোক একত্র হয়ে-

ছিল। অজিত তাদের প্রতিজ্ঞা করিয়েছে, স্বরাজের জন্য তারা মরবে। সেই প্রতিজ্ঞাই আজ ঝড়ের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

এর ওপর আর বিশেষ কিছু খবর সংগ্রহ করতে পারিনি। অজিত এখন কোন্ দিকে গিয়েছে, তা'ও জানতে পারিনি। গ্রামের লোকদেরও বেশী কিছু প্রশ্ন করতে ভয় করছিল। তারা গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করে।

একটা ব্যাপার দেখে কিন্তু আমি আমার ধারণা বদ্‌লাতে বাধ্য হয়েছি। অজ পাড়াগাঁয়ে পলিটিক্স করার কি বস্তু আছে, আগে আমি কিছুই জানতাম না। বাবলার বনে আর পিলেপেটা মানুষের বুকে কোন সাহস প্রতিজ্ঞা আর আগ্রহ থাকতে পারে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। কিন্তু আমার চোখেদেখা ঘটনাকেও এখন স্বপ্ন বলে মনে হয়। স্বরাজের নামে আমাদেরই গাঁয়ের দীনহীন মানুষগুলি মরিয়া হয়ে উঠতে পারে, জীবনপণ করতে পারে, তারই শত শত ইতিহাস যেন প্রকৃতির নিয়মে ঘটে চলেছে দেখতে পেলাম। আরও বুঝতে পারলাম, কেন অজিতের মতিচ্ছন্ন হয়েছে। গ্রামের মানুষের হৃদয়ে অজিত রাজা হয়ে বসেছে। অজিতের ওপর কী শ্রদ্ধা, কী বিশ্বাস, কী মমতা আর বাধ্যতা। কোটী টাকা ঘুষ দিয়েও এ জিনিষ কেনা যায় না। অজিত লুব্ধ হবে, মুগ্ধ হবে, ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

হ্যাঁ, সবার আগে আপনার দাবী। আপনার জীবনের বাসরে আলো নিভিয়ে দেবার অধিকার অজিতের নেই। আমি স্বীকার করি, আপনার সুস্পষ্ট অভিযোগের প্রশংসা করি। আপনার নারীত্বের মর্য্যাদাকে, আপনার মাতৃত্বের সৌভাগ্যকে, আপনার সংসারের রক্ত-মাংসের ধর্মকে বঞ্চনা করার কোন অধিকার অজিতের নেই।

তবু, বিশ্বাস ছাড়বেন না। শান্ত হবার চেষ্টা করুন।

শুভানুধ্যায়ী, শ্রীকান্ত রায়।

(৬)

ডায়মণ্ড হারবার

৫ই নভেম্বর ১৯৪২

শ্রীরমা দেবী

প্রীতিভাজনীয়াসু—

আবার গিয়েছিলাম নিমাইপুরের দিকে। সেবার দেখে এসেছিলাম, নিমাইপুরে মানুষের প্রাণের সমারোহ। এক উন্মাদনার ছন্দে পঁচিশটা গ্রামের প্রাণ দুর্মদ হবে উঠেছে। নির্ভীক গ্রামের সেই হুঙ্কার এখনো আমার কানে বাজছে।

খবর পেয়েছি, অজিত গ্রেপ্তার হয়েছে। শেষরাত্রির চোরা অন্ধকারে অজিতকে তার আশ্রম থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ নিয়ে গেছে। কোন্ পথ দিয়ে নিয়ে গেছে, গ্রামের লোকে বুঝতে পারেনি। জানতে পারলে ভয়ানক একটা হাঙ্গামা বাধতো। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত গ্রামের লোকেরা খালের ধার দিয়ে ক্রোশের পর ক্রোশ ছুটেছে, প্রত্যেক নৌকাকে তাড়া করেছে। পঁচিশটা গ্রামের ক্ষোভ যেন অজগর হয়ে মাথার মাণিক খুঁজে বেড়িয়েছে। কিন্তু অজিতের সন্ধান তারা পায়নি। আমি জানতে পেরেছি, অজিত এখন জেলে আছে।

নিমাইপুর থেকে এবার একটা শোক পেয়ে ফিরে এসেছি। এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, তাই মনটা বড় বেশী বিষণ্ণ ও উতলা হয়েছে। যা দেখে এলাম, আর যা শুনে এলাম, সব ভুলে না যাওয়া পর্যন্ত সুস্থ হতে পারবো না।

নিমাইপুর ভেসে গেছে, খরা জলের উচ্ছ্বাস গ্রামের প্রাণকে ডুবিয়ে দিয়েছে, ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কোথা থেকে রাত্রির অন্ধকারে কলকল শব্দে এক তরল অভিশাপের স্রোত গ্রামের মাঠের ওপর গড়িয়ে পড়লো। তারপর অন্ধকারের বুকে আর্তনাদ ছড়িয়ে দিয়ে বন্যা ছুটে এল। সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। অসহায় গ্রামের নর নারী শিশু দৌড়তে আরম্ভ করলো। কিন্তু কে বাঁচাবে, কে তাদের রক্ষা করবে? আশ্চর্য ওদের বিশ্বাস, অজিত থাকলে নাকি বাঁচবার একটা পথ হতো।

অজিত নেই কিন্তু আর একটি মানুষ ছিল। অশথতলায় একটা কুটীরে এই সন্ন্যাসী থাকতেন—নাম কপিলানন্দ। গ্রামের লোকেরা ছুটে এসে আবেদন জানালো—বাবা বাঁচাও।

বহুদিন ধরে গ্রামের হৃদয়ের দ্বারপ্রান্তে প্রহরীর মত জেগে আছেন বৃদ্ধ কপিলানন্দ। বহু শিবস্তোত্র গঙ্গাস্তোত্র শুনিয়েছেন। গ্রামবাসীর শ্রদ্ধার অন্নে বহু বৎসর জীবন যাপন করেছেন। শেষ পর্যন্ত কপিলানন্দ তাঁর কর্তব্য করে গেলেন।

—আমি তোমাদের বাঁচাবো। কুটীরের চালার উপর উঠে দাঁড়ালেন কপিলানন্দ। হাত তুলে গঙ্গাস্তোত্র পাঠ সুরু করলেন। পেছনে গাছের মাথায় চড়ে সন্ত্রস্ত পাখীর মত গাঁয়ের লোকেরা দেখলো—জলের তোড় রুষে এসে কপিলানন্দের কুটীরে একবার আঘাত করলো। কপিলানন্দ পেছনের দিকে তাকিয়ে শুধু বললেন—ভাই সব, চললাম—।

একটা তোড়েই কপিলানন্দের চালা ভেসে গেল। ঠাণ্ডা কালো লোনা নিষ্ঠুর রুষ্ট জলের আবর্তে মিলিয়ে গেলেন কপিলানন্দ।

হাজার হাজার মানুষ গরু বাছুর মরেছে। ক্ষেত খামার ভেসে গেছে। যারা বেঁচে আছে, তাদের মুখে শুনে এলাম—অজিতদাদা থাকলে বাঁচতাম।

আমি আবার খবর নিচ্ছি। কোথায় কোন জেলে অজিত আছে, কেমন আছে। সব জানতে পাবেন।

শুভানুধ্যায়ী, শ্রীবান্ত রায়

(৪)

ডায়মণ্ড হারবার

৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩

শ্রীরমা দেবী

প্রীতিভাজনীয়াসু—

এবার আপনার চিঠি পেয়ে একটু আশ্চর্য হয়েছি। অজিতের সম্পর্কে আমি যে সব প্রশংসার কথা লিখেছে, তাকে আপনি নিছক বন্ধু-প্রীতির উচ্ছ্বাস মনে করে বিদ্রূপ করেছেন। 'গ্রামবাসীর হৃদয়ে রাজা হয়ে আছে অজিত', আপনি একথা শুনে নাকি হেসে ফেলেছেন। লিখেছেন, গ্রামবাসীর হৃদয়টা সিংহাসন নয়, একটা ছেঁড়া কাঁথা মাত্র। তার ওপর যে ঠাঁই নিয়েছে, সে রাজা হয়নি, বৈরাগী হয়েছে। এত কঠোর কথা আপনি কেমন করে লিখতে পারলেন? যার হৃদয়ের রাজা হওয়ার মত গর্বের সিংহাসন তৈরী হয়েছিল, অজিত সেখানে ঠাঁই নিতে পারেনি। সে পালিয়ে গেছে। সেই পৌরুষ ও যোগ্যতা তার নেই। আপনি এই সব কথাও লিখেছেন। আপনি নাকি এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। আপনার তরুণ বয়সেব সব চেয়ে বড় দাবী উপেক্ষিত ও অপমানিত হয়েছে অজিতের কাছে। সে তার স্বামিত্বের কর্তব্য পালন করেনি। অজিতের জেল-যাওয়া ব্যাপারটাকেও আপনি ব্যঙ্গ করেছেন। আপনি মাপ করবেন, আপনার এতটা তীব্র উষ্মা আমার কাছে একটু বিসদৃশ মনে হয়েছে। কিন্তু ঠিক কোন্ যুক্তি দিয়ে আপনাকে প্রতিবাদ করা যায়, তাও আমি জানি না।

অজিতের আদর্শ ও পলিটিক্স নিয়েও আপনি নানা মন্তব্য করেছেন। আপনি বলেছেন—যদি তার মধ্যে কোন বিপ্লবী মানুষের পরিচয় পাওয়া যেত, আধুনিক মতবাদের কোন আভাস থাকতো একটা ইনটেলেক্চুয়াল দৃষ্টিভঙ্গী থাকতো, তবে আপনি সবই মাপ করে দিতেন। আপনার সারা জীবনের শিক্ষা ও রুচির সত্যকে অজিত অগ্রাহ্য করেছে। নেড়ামাথা হয়ে, আট হাতি মোটা খদ্দরের ধুতি পরে, চরকা, হরিজন আর গোসেবা করে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সঙ্কীর্ণ পথে পেছনে পালিয়ে গেছে অজিত। সম্মুখ পথে এগিয়ে যাবার সাহস, বীর্য ও বুদ্ধি নেই তার। জীবনের এই ব্যর্থতাকে ঢাকবার জন্যেই গ্রামসেবা নামে অদ্ভুত একটা অজুহাত নাকি সে পেয়েছে। আপনি রুশিয়া, চীন ও আয়র্ল্যাণ্ডের বিপ্লবী কর্মীদের কথা তুলনা করেছেন।

আমি আবার মাপ চাই, এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অপারগ। আপনি শিক্ষিতা সহরের মেয়ে, আপনি অনেক পড়াশুনা করেছেন। আপনার রীতিতে যা ভাল বুঝেছেন, তাই বলেছেন। আমি প্রতিবাদ করতে চাই না। অজিতের পলিটিক্স আমিও বুঝি না। কিন্তু আপনি যেভাবে তার নিন্দে করেন, ততটা করার মত সাহস ও অহংকার আমার নেই। যাকে আপনি পুরাতন ও প্রাগৈতিহাসিক বলে অবজ্ঞা করছেন, আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, একবার ভাল করে চোখ মুছে নিয়ে তাকালেই সেই জিনিসকেই ভাবীকালের দীপ, ইতিহাসের সেরা সাধনা, বহু দূর এগিয়ে-যাওয়া পথিকের হাতের নিশান বলে মনে হবে।

আমি মাঝখানে নিমাইপুরে আর একবার গিয়েছিলাম। গুজব শুনেছিলাম যে অজিত নাকি ছাড়া পেয়েছে। কিন্তু দেখলাম, গুজবটা সত্য নয়। অজিতের দেখা পেলাম না। নিমাইপুরের দশাও স্বচক্ষে দেখে এলাম। সর্বনাশের ছোঁয়া লেগেছে নিমাইপুরে। নিমাইপুরের

বাতাসে আর হাসির শব্দ নেই, কীর্তনের সুরের রেশ ভেসে বেড়ায় না। উৎসবের ঢাক বাজে না। ধান চাল উধাও হয়েছে। দল বেঁধে গ্রামের নারীপুরুষ যাযাবর মানুষের মত কলকাতার দিকে রওনা হয়েছে। লোনা জলের নিষ্ঠুর স্ফীতি যে-গ্রামের হাসি আর সাহসকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি, সেই নিমাইপুর আজ পেটের ক্ষিদেয় শ্মশানকুকুরের মত ছুটোছুটি করছে, নিমাইপুর ভেঙে যাচ্ছে।

দেখে এলাম, অজিতের চরকা আশ্রমটাও ভেঙ্গে গেছে। কয়েকটা খুঁটি আর ভিটে পড়ে আছে। অজিতের পোষা মৌমাছির একটা চাক এক কোণে তখনো পড়েছিল। চারিদিকে কতগুলি মরা মৌমাছি ছড়িয়ে ছিল। অসহায় নিমাইপুরের এই আকস্মিক বেদনার আবির্ভাবকে ধিক্কার দিয়ে রাণী মৌমাছিটা পালিয়ে গেছে সবার আগে। চাক শূন্য !

শূণ্য শূণ্য ! দুর্ভিক্ষ ! নিরন্নতা ! অজিত নিশ্চয় ছাড়া পায়নি, কোথাও তার সন্ধান পেলাম না।

পরে যদি কোন খবর পাই, তবে জানাবো।

শুভানুধ্যায়ী শ্রীকান্ত রায়

(৫)

ডায়মণ্ড হারবার

১৪ই এপ্রিল ১৯৪৩

শ্রীরমা দেবী

প্রীতিভাজনীয়াসু—

আর একবার নিমাইপুরের দিকে যাব ভাবছিলাম। কিন্তু আপনার চিঠি পেয়ে উদ্যোগ স্থগিত রাখলাম। আপনার সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্য লিখেছেন।

হ্যাঁ, আমি শীঘ্রই কলকাতা যাব, আপনার সঙ্গে দেখা করবো। এত-দিন সাহস করিনি এই কারণে যে আপনি আমার ওপরেও বিরূপ হয়ে আছেন। কিন্তু আপনার শেষ চিঠিতে আমার সেই শঙ্কা মুছে গেছে। জীবনের সঙ্কটে আপনাকে সৎপরামর্শ বা নির্দেশ দেবার যোগ্যতা আমার আছে, একথা লিখে আপনি আমাকে বেশী প্রশংসা করে ফেলেছেন।

অজিতের আশ্রমের চাল থেকে রাণী মৌমাছিটা পালিয়ে গেছে, এ খবর শুনে আপনি খুসী হয়েছেন। বুঝলাম না, কেন খুসী হয়েছেন। লিখেছেন এটা স্বাভাবিক, জীবনের নিয়ম, অবমাননার প্রতিশোধ! কিন্তু সত্যিই তাই কি? এর মধ্যে কি ক্ষমার অবকাশ নেই? আর একবার ভাল করে বুঝে দেখবার নিয়ম নেই?

সত্যি কথা, আমার বন্ধু অজিতের পক্ষে আমি টেনে কথা বলেছি। আপনার অভিযোগ সত্য। কি করবো বলুন? অজিত আমার বন্ধু। আপনার দিক্‌টা উপেক্ষা করেছি। হয়তো করেছি, কিন্তু ইচ্ছে করে নয়। বুঝতে পারিনি বলেই। আজ আমি স্বীকার করি, মীরা দেবী, আমি সব বুঝতে পারছি।

আপনি জীবনের এই একাকিত্ব সহ্য করতে পারছেন না। না, আপনার দোষ দিই না। আপনি ঠিকই লিখেছেন, যদি অজিত আপনার কোলে একটি শিশু মানুষের অবির্ভাবকে সত্য করে দিয়ে যেত, আপনি জীবনের একটা অবলম্বন পেতেন। এই নির্বাসনের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতেন। আপনাকে দোষ দিতে পারবো না, আপনি নিঃসঙ্কোচে আপনার মর্মকেই ব্যক্ত করেছেন। অজিতের সম্বন্ধে আপনার যা সন্দেহ হয়তো সেটা সত্য। আপনাকে সান্ত্বনা দেবার মত কথা খুঁজে পাই না।

নিমাইপুর যাবার এখন আর ইচ্ছা নেই। কবে কলকাতা যেতে পারবো, পরের চিঠিতে জানাবো।

আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন।

ইতি—শ্রীকান্ত রায়

(৬)

ডায়মণ্ড হারবার
৮ই জুন ১৯৪৩

শ্রীরমা দেবী
প্রীতিভাজনীয়াসু—

কলকাতা যাবার সুযোগ পাইনি এবং সময় করে উঠতে পারিনি। তার কারণ, খবর পেলাম অজিত জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে এবং নিমাই-পুরের দিকে গিয়েছে।

এবারের খবরটা গুজব নয়। সত্যি খবর। সেদিনই নিমাইপুরের দিকে রওনা হ'লাম, অজিতের দেখা পেলাম, তারপর ফিরে এলাম।

ফিরে এসেই আপনাকে চিঠি লিখছি। এর পর আপনাকে চিঠি লেখবার প্রয়োজন হবে না। তাই তাড়াতাড়ি আমার শেষ কথা জানিয়ে দিচ্ছি। আমার মনের ওপর দুঃসহ একটা শাস্তির ভার চেপে রয়েছে। লেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই ভার নামবে না।

অজিতের ইতিহাস শুনুন। এই ইতিহাস শুনে একবার দু'চোখ বন্ধ করে নিজের অন্তরের দিকে তাকাবেন। ধ্যানের শ্রদ্ধা দিয়ে এই ইতিহাসের প্রতিটি কাহিনীকে বিচার করে দেখবেন। আপনার কাছে আমার এই অনুরোধ।

জেল থেকে ছাড়া পেয়েই অজিত নিমাইপুরে এসেছে। খালের কিনারা দিয়ে হেঁটে কঙ্কালের সংখ্যা গুণ্‌তে গুণ্‌তে, বাবলা বনের ছায়ায় ছড়ানো খুলি গুণ্‌তে গুণ্‌তে অজিত নিমাইপুরে পৌঁছেছে। যারা একদিন অজিতের সঙ্গে হেসে কথা বলেছে, প্রতিজ্ঞা পাঠ করেছে, রামায়ণ গান করেছে, এসব তাদেরই কঙ্কাল আর করোটি। অজিতের অভ্যর্থনা পথে

এরাই হয়তো জয়ধ্বনি করতো, কিন্তু আজ এরা অস্থি হয়ে ছড়িয়ে আছে ধুলোর ওপর, নিমাইপুরের প্রাণ লুঠ হয়ে গেছে। জনশূন্য গ্রাম, ভগ্ন কুটীর, গলিত ভিটা, নিস্তব্ধ ঢেঁকিঘরে শেয়াল ঘুমোয়। সবাই মরেছে আর পালিয়েছে। যারা রয়েছে, তারা মরবার জন্যেই রয়েছে।

অনেক করেই অজিতের দেখা পেয়েছি, দিনের বেলায় তাকে দেখা যায় না। শুনলাম পুলিশ আবার ওর খোঁজ করছে। এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম পুলিশ ওকে তাড়া করে ফিরেছে।

গ্রামটার নাম বৈকুণ্ঠের হাট, এইখানে অজিতের সঙ্গে আমার দেখা হলো। মাঝ রাত্রিতে চাঁদ উঠলো। আমরা দুজনে একটা পুকুরের ধারে বসে গল্প করছিলাম। পুকুরের চারিদিকের মেটে বাড়ীগুলি জনশূন্য, ভেঙে খসে পড়েছে। উঠোনে আগাছা ভরে গেছে। অজিতকে বললাম—আর কেন? এইবার কলকাতা ফিরে যাও।

অজিত উত্তর দিল—আমার অনেক কাজ আছে, এখন যেতে পারবো না।

—কি করবে এখানে? কি করবার তোমার সাধ্যি আছে?

—এই একটু আধটু গঠনমূলক কাজ করবো।

খবরের কাগজের ভাষায় উত্তর দিল অজিত। তার অর্থ আমার বোধগম্য হলো না। কিন্তু আমাকে ফিরতেই হবে। মনের রাগ মনেই চেপে রেখে আমি বিদায় নিলাম। শেষ রাত্রের মধ্যে খালের মুখে পৌঁছে নৌকো ধরতে হবে। আর দেরী করার সময় ছিল না।

—তা'হলে আসি। আমি দু'পা এগিয়ে গেলাম। অজিতও তার কাজে লেগে গেল।

অজিতের হাতে একটা থলে। তার মধ্যে রেড়ি আর কার্পাসের বীজ। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকালাম। অজিত কাজ করে

চলেছে, থলে থেকে রেড়ি আর কাপাসের বীজ বের করে এক একটা উঠোনের চারদিকে মাটিতে বুন্‌ছে, ছড়িয়ে দিচ্ছে।

হ্যাঁ, আমার বন্ধু অজিতকে দেখলাম। দিনমানের আলোকে তাকে পুলিশে তাড়া করে বেড়ায়। রাত্রির জ্যোৎস্নায় আর অন্ধকারে সে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এক পরিত্যক্ত সংসারের আঙিনা থেকে আঙিনায় ঘুরে বেড়ায়। রেড়ি আর কাপাসের বীজ ছড়িয়ে দেয় দু'হাতে। শ্মশানের শেয়াল ডাকে, রাত্রির কোকিল কাঁদে—সহায় সম্বলহীন গঠনমূলক কর্মী আমার বন্ধু অজিত শুধু কাজ করে যায়। বুড়ো কপিলানন্দের ব্রহ্মতেজ যে গ্রামের প্রাণকে রক্ষা করতে গিয়ে হার মেনেছে, সেইখানে মৃত্যুকে পরাভূত করার আয়োজন করছে অজিত। চারদিকের অস্থি কুড়িয়ে সঞ্জীবনী মন্ত্র পড়ছে, বিদায়ী প্রাণগুলিকে ফিরিয়ে আন্‌ছে।

যারা গিয়েছে তারা সবাই ফিরে আসবে। আবার এই গ্রামের কুটীরে মানুষের সাড়া ধ্বনিত হবে। শ্মশানের অভিশাপকে শুধু নিজের বুকের নিশ্বাসের জোরে উড়িয়ে দিয়ে প্রাণের বীজ বপন করেছে অজিত। বিবর্ণ মেদিনীর শোণিতে গর্ভসঞ্চারের পুলক জাগছে। অজিতকে দেখতে পেলাম—এক মনে কাজ করে চলেছে, এক মহাবিপ্লবী পুরুষোত্তমের মূর্তি।

আর বৃথা দেরী করবেন না, মীরা দেবী। নিমাইপুরে চলে যান, অজিতের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। ওকে আপনি চিনতে পারেন নি, তাই ওর ঐশ্বর্য আদর করতে পারেন নি, নিমাইপুরে চলে যান, অজিতের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করুন। যা খুঁজছিলেন, তার চেয়ে বেশী পাবেন। লক্ষ শিশুর চুম্বনের আস্বাদ বুক ভরে পাবেন, অজিতের কাছে চলে যান।

আমাকে ক্ষমা করবেন। ইতি—শ্রীকান্ত রায়
